LIFE OF MOLLA OMAR

মোল্লা উমর

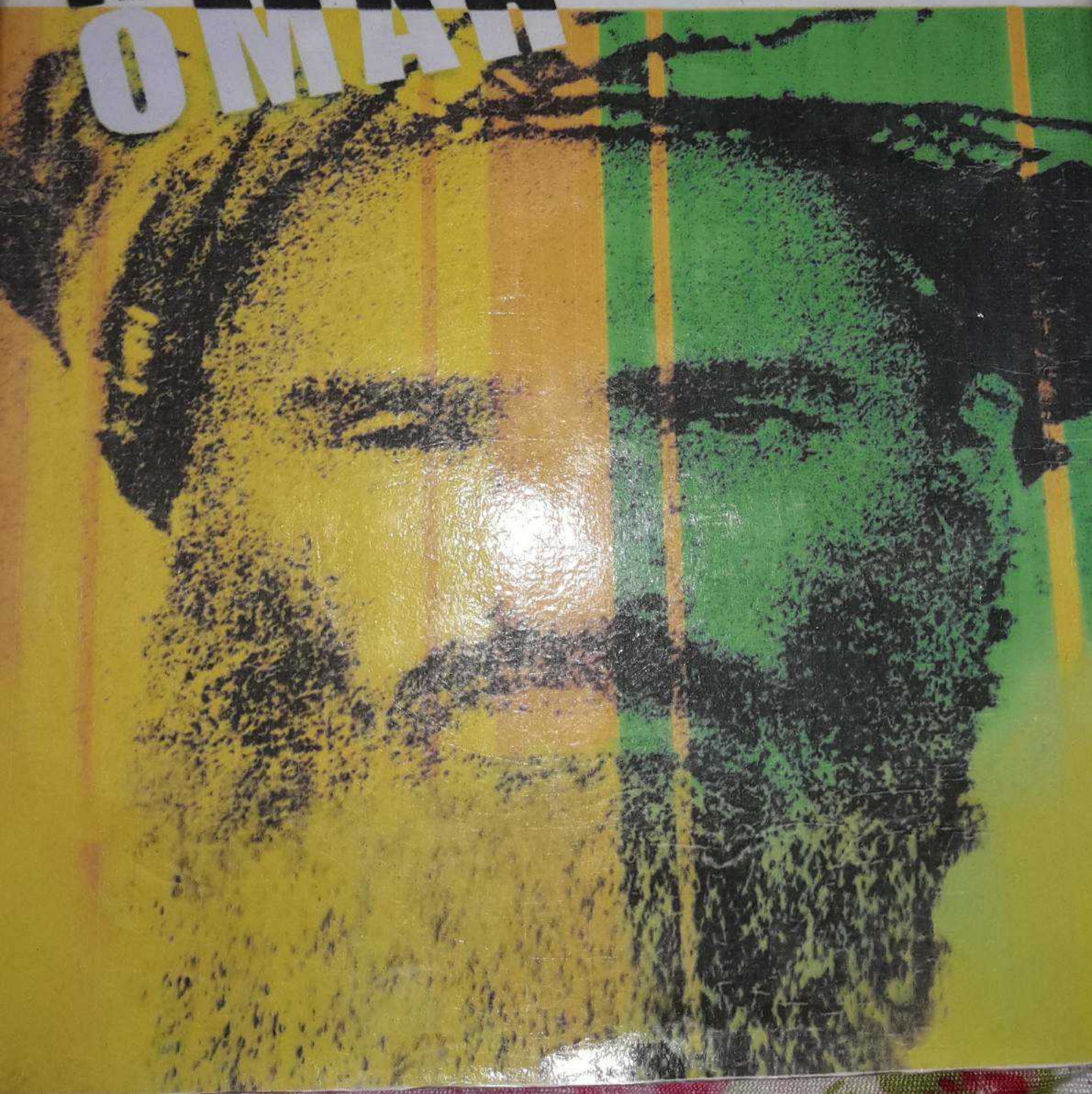

12-4-2018

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর

মূল
ফকীরুল্লাহ ওরদাগ

অনুবাদ
ইবনুত তাওহিদ

মাজহুল প্রকাশনী

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর

ফকীরুল্লাহ ওরদাগ

*

অনুবাদ

ইবনুত তাওহিদ

*

প্রকাশনা

মাজহুল প্রকাশনী

মুখবন্ধ

একজন মহামানব। তবে খুব সাদামাটা। রহস্যময় ও স্মৃতিবহুল তাঁর জীবন। ১৯৬০ সালে কান্দাহার প্রদেশের খাকরিজ জেলার চাহইহিম্মত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ। তিনি হোটাক নৃগোষ্ঠির তোমজি গোত্র থেকে এসেছেন। বাবার নাম মৌলভী গোলাম নবী। যিনি একজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও সামাজিক নেতা ছিলেন। মোল্লা ওমরের জন্মের পাঁচ বছর পর তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর মোল্লা ওমরের পরিবার উরুজগান প্রদেশে চলে যায়। দুনিয়াতে চোখ মেলেই তিনি দেখতে পেয়েছেন গগণচুম্বি পর্বতমালা। শৈশবে তাঁর কোমল পা মাড়িয়েছে কাঁকর বিছানো পথ। জীবনের সূচনাতেই দীক্ষা পেয়েছেন ইসলামের পবিত্র বিধান জিহাদের। দীনকে বিজয়ী করার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়ার আগ্রহ তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল সেই ছোট্ট বয়সেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনারা আফগানিস্তান দখল করে নিলে ওমর মাদরাসা ছেড়ে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে জিহাদিতে পরিণত হন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

কেনই বা এমন হবে না। ইসলামী পূনর্জাগরনের এই মহামানব যখন খুব ছোট, আশপাশের অনেক কিছুই বুঝতে শেখেননি, তখন তাঁর সামনে ছিল লাশের সারি। লাশের সারিতে ছিল তার মত ছোট ছোট অনেক শিশুও। ছিল লাঞ্ছিত নারী আর আহত বৃদ্ধদের আর্তচিৎকার। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা বসতিগুলোর পাশ দিয়ে যখন ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতেন, তখন তিনি শুনতে পেতেন, আহতদের গোঙ্গানী আর স্বজন হারাদের আর্তনাদ। মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহ একের পর এক ঘটতেই থাকত। একটি দুটি নয়; বরং এসব ঘটনা ছিল তার নিত্য দিনের সাথী।

মর্মান্তিক দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে তার জীবন যখন কৈশোরের দোরগোড়ায়, একদিন তার কচিমনে প্রশ্ন জাগে, এসব হচ্ছে কেন? মানুষ কেন মানুষকে গাজর-মুলার মত কেটে বেড়াচ্ছে? পিতাকে সন্তান থেকে, সন্তানকে তার মা থেকে কেন পৃথক করা হচ্ছে? নিরাপরাধ নারীকে কেন হতে হচ্ছে বিধবা, সন্তানহারা?

এ জাতীয় কিছু প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসে জটলা সৃষ্টি করত এই কিশোরের মনে। প্রশ্ন যতই জটিল হোক, উত্তর খুঁজে পেতে তার বেশি বেগ পেতে হয়নি। কারণ, তার ক্ষুদ্র জীবনের বেশিরভাগ সময় পার হয়েছে সম্পূর্ণ একটি ধর্মীয় পরিবেশে। পরিবারের সদস্যদের মুখে শুনতে শুনতে ইসলামের যে মৌলিক জ্ঞান তার অর্জন হয়েছিল তাই যথেষ্ট ছিল, এসব প্রশ্নের উত্তর হিসেবে।

একসময় তিনি বুঝতে পারলেন এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান জিহাদ। শুধুই জিহাদ। বিষয়টি তার মনে এতটাই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, এক মুহূর্তের জন্যও এর বিকল্প খোঁজার চিন্তা তার মাথায় এল না। তাই যৌবনের শুরুতেই তিনি রাশিয়ার আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। সেই জিহাদের ময়দানে কেটে যায় সুদীর্ঘ এক যুগ। মুজাহিদদের নিষ্ঠাপূর্ণ ত্যাগ ও কোরবানীর ফলে রাশিয়ার পতন হলেও আফগান জাতির দুর্দশার অবসান ঘটল না। তাঁর চোখের সামনে আবার ঘটতে লাগল শৈশবের সেই বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো। গতকাল যারা আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে বুকটান করে দাঁড়িয়েছিল আজ তাদেরই একটি অংশ ক্ষমতার লোভে গোটা আফগান জুড়ে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল।

তিনি দেখতে লাগলেন, আবার তার চারপাশে চলছে হত্যা, লুণ্ঠন আর অমানবিক কার্যকলাপ। চারিদিকে নিরাপত্তাহীনতা আর অরাজকতার সয়লাব।

নতুন করে তিনি ভাবতে লাগলেন, এর সমাধান কী? তবে এখন তিনি কিশোর নন; বরং দীর্ঘ একযুগ জিহাদের ময়দানে কাটানো একজন অভিজ্ঞ রণবীর। কুরআন-সুন্নাহ আর জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, বর্তমান সমস্যার সমাধানও একমাত্র জিহাদের মাধ্যমে সম্ভব। আফগান জাতির দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন 'ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা'ও সম্ভব একমাত্র এই পথেই।

সেদিনই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন জালিমের পথ রুখে। প্রস্তুত করলেন কয়েকজন সঙ্গী। গরীব কিছু তালিবে ইলম (মাদরাসা-শিক্ষার্থী)। হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রের এই জামাত অতি অল্প সময়েই হাজারের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল।

মাদরাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের এ জামাতটি জালিম ও বর্বর শক্তির সামনে সিকান্দারের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জুলুম ও বর্বরতা চর্চাকারীদেরকে এমন শিক্ষা দিল যে, এতে দীর্ঘদিনের নির্যাতনের শিকার দুর্বল শিশু ও অবলা নারীর ক্ষতবিক্ষত অন্তর প্রশান্তি অনুভব করল।

মাদরাসা-পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের এ জামাতটি অল্প দিনের ব্যবধানে দুনিয়ার 'সুপার পাওয়ার' দাবীদারকে 'সিফির পাওয়ার' (পাওয়ার লেস) করে ছাড়ল।[১]

কে এই মহামানব? যাকে দেখেতেই সাহাবাদের মনে পড়ে। একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যাকে প্রথম দেখাতেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাযি.-এর যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি, তার সবগুলোই আমি এই ব্যক্তির মাঝে পেয়েছি। তিনি আর কিছুই নন, ওমর ইবনে খাত্তাবেরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাই আমি তার দর্শনের পর নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি।

তিনি হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব, বর্তমান দুনিয়া যাকে 'মোল্লা ওমর' নামে চেনে। পুরো দুনিয়ার মুসলমান যাকে নিজেদের আমীর বলে মেনে নিয়েছে। আরব-অনারব, সাদা-কালো, জ্ঞানী-মূর্খ সবাই তার হাতে বাইয়াত নিয়েছে। একত্র হয়েছে তাওহীদের কালেমাখচিত পতাকা তলে। তাই মুমিনগণ শ্রদ্ধাভরে তাকে বলেন, 'আমীরুল মুমিনীন'।

মোল্লা ওমরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি কখনই বিচলিত হন না, কখনও মেজাজ হারান না, সাহসও হারান না। নিজের সহকর্মীদের চেয়ে কখনই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেন না।

বিশেষ ধরনের কৌতুকবোধের অধিকারী এই মানুষটির নিজের কোন বাড়ি নেই, বলার মত কোন সম্পদও নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় মোল্লা ওমরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এক কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছে।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান দখলের পর থেকে মোল্লা ওমরকে আর কখনও দেখা যায়নি। তার প্রিয় অস্ত্র আর পিজি সেভেন। মোল্লা ওমর থাকেন কোথায় তা কেউ না জানলেও তিনি সবসময় আফগানিস্তানের প্রতিদিনকার ও বিশ্বের সব ঘটনার খবরাখবর রাখেন।

---

[১] যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় আমেরিকা এখনও তার পূর্বের শক্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিবর্গের কাছে এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বাস্তবেই এ যুদ্ধে আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি চরমভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। এখন আর তারা যে কোন রাষ্ট্রে একাকী হামলা পরিচালনার সামর্থ্য রাখে না। তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

মোল্লা ওমর জীবিত এবং সুস্থ রয়েছেন। কঠিন বর্তমান আর শত্রুর নজরদারির মধ্যেও তার প্রাত্যহিক কাজকর্মে তেমন কোন পরিবর্তন বা ছেদ আসেনি। এখনও তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় আছেন।[২]

আল কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে থেকে দল পরিচালনায় সব ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন মোল্লা ওমর।

কোনো কোনো বিশ্লেষণের ধারনায় মোল্লা ওমর আফগানিস্তানের পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর অবস্থান করে বা পাকিস্তান সীমান্তের ভিতর থেকে দল পরিচালনা করছেন।

১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফতের পতনের পর সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ভাগ্যাকাশ ছেয়ে গিয়েছিল কষ্টের কালো মেঘ। ফিলিপাইন থেকে মরক্কো পর্যন্ত, কেনিয়া থেকে বসনিয়া পর্যন্ত মানচিত্রের যেখানেই কোন লালচিহ্ন দেখা যেত কারওই বুঝতে ভুল হত না যে, এ লাল আর কিছু নয়, মুসলমানের নিষ্পাপ রক্ত। দুনিয়ার কোথাও আগুনের ফুলকি দেখা গেলে সবাই বুঝতে পারত এ আগুন কোন না কোন মুসলিম জনপদকেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কোথাও মুসলিম জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তো দূরে থাক, উচিত পাওনাটুকু দাবী করার অধিকারও ছিল না।

মুসলিম বিশ্বের এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমীরুল মুমিনীন মোলা মুহাম্মাদ ওমর (হাফিজাহুল্লাহু)-ই একমাত্র ব্যক্তি, যার হাত ধরে আফগান ভূমিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দী পর দুনিয়ার আকাশে আবার উড়তে শুরু হেলালী ঝাণ্ডা। তাঁর হাতে জিহাদের দীক্ষা নেয় পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে ছুটে আসা মুক্তিপাগল মুসলিম তরুণরা। যারা আজ ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করছে।

এমন মহামানবকে যদি আমি 'ওমরে ছালেছ' তথা তৃতীয় ওমর বলে দাবী করি, তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে আমি শব্দের অপপ্রয়োগকারী বলে গণ্য হব না।

—ফকীরুল্লাহ ওরদাগ

---

[২] বইটি বাংলায় প্রকাশ হওয়ার মুহূর্তে তালেবান কর্তৃক মোল্লা ওমর মুজাহিদের শহীদ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আফগানিস্তানের মানচিত্র ও ঐতিহাসিক পটভূমি

আফগানিস্তান এশিয়া মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত। তার উত্তর দিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। বর্তমানে উত্তর দিকে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান। উত্তরপূর্ব দিকে আছে তাজিকিস্তান, পূর্বে চীন, দক্ষিণ পূর্বে পাকিস্তান এবং পশ্চিমে অবস্থিত ইরান।

আফগানিস্তানের মোট আয়তন ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার (৬,৫২,০০০) বর্গকিলোমিটার এবং তাতে ঊনষাট শতাংশ (৫৯%) পখতুন, ঊনত্রিশ শতাংশ (২৯%) তাজিক, তিন শতাংশ (৩%) হাজারা গোষ্ঠী আর বাকী অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে। রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহরের নাম কাবুল। ভাষা পশতু ও ফারসী, ধর্ম ইসলাম এবং মুদ্রা আফগানী।

বংশপরাম্পরায় আফগান জাতি

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী এবং খৃষ্টাব্দ দশম শতাব্দীতে সুলায়মান পাহাড়ের উপর আফগানদের পূর্বপুরুষ আব্দুর রশীদ কায়সের রাজত্ব ছিল। তার তিন পুত্র ছিল– ১. গারগাস্ত ২. বিটনী ও ৩. সিরকন। গোর পাহাড় হতে সুলায়মান পাহাড় পর্যন্ত এলাকা তাদের দখলে ছিল। কথিত আছে যে, আফগান জাতি এ তিন জনেরই বংশধর।

আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম ও সুফী সাধকগণ

আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকজন সুফী সাধক ও ওলামায়ে কেরাম জন্মগ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ., মুহাম্মদ ইবনে আকরাম রহ., আবু ইসহাক জাওযেজানী রহ., ইবরাহীম আদহাম রহ., আবু সুলাইমান মুসা রহ., ইমাম আবু দাউদ রহ., আবু মাশার বলখী রহ., ইবনে কুতাইবা মারওয়াযী রহ., ইবরাহীম ইবনে তালহা রহ., মুহাদ্দিস বাসানী রহ. ও ইবরাহীম ইবনে রুস্তম মারাবী রহ. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল বিরুনী, ইবনে সীনা, ইবনে মাসকূয়া, আবুল ফযল বাইহাকী নাসরুল্লাহ, মুযাফফিক হারাবী, আবুলহীন হাযুইরী (দাতাগঞ্জ বখস রহ.)

ফেরুসী, তূসী, উনসুরী, মনূ চেহরী, সানাঈ, নাসের খসরু, আবুল ফরজ রুফী এবং মুখতারী গজনবীর মত জ্ঞানীগণ জন্ম নিয়েছেন।

আফগানিস্তানের সময়, সীমানা, প্রসিদ্ধ শহর, বিমান বন্দর, ক্যান্টনমেন্ট প্রসিদ্ধ রাজপথ, তার দূরত্ব ও বাণিজ্যিক পথ পরিচিতি

আফগানিস্তান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি পাহাড়ঘেরা দেশ। সময়ের ব্যবধান পাকিস্তানের তুলনায় আধা ঘণ্টা পিছনে থাকবে। আফগানিস্তানের মোট আয়তন ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার বর্গ কিলোমিটার। পুরাতন বই পুস্তকে দেখা যায় যে, আফগানিস্তানের মোট আয়তন হল সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আফগানিস্তানের মানচিত্র বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল এই যে, প্রায় এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের চেয়েও অধিক এলাকা জোরপূর্বকভাবে ইরান দখল করে রেখেছে। যা বর্তমানে বেলুচিস্তান ও খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত। ইরানের ভয় হল এই যে, তালেবান রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে গেলে আফগানীরা তাদের এলাকা ফেরত চাইতে পারে।

আফগানিস্তানের সীমানা : পশ্চিমে ইরানের সাথে রয়েছে ১৩০০ কিলোমিটার। দক্ষিণ পূর্বে পাকিস্তানের সাথে রয়েছে ২৩০০ কিলোমিটার, চীনের ১৫০ কিলোমিটার এবং উত্তরে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের সাথে রয়েছে ৩২৪০ কিলোমিটার।

আফগানিস্তানের ৬টি কেন্দ্রীয় শহর রয়েছে– ১. রাজধানী কাবুল ২. জালালাবাদ ৩. পশ্চিম আফগানিস্তানে হেরাত ৪. দক্ষিণ আফগানিস্তানে কান্দাহার ৫. মধ্য আফগানিস্তানে গজনী ৬. উত্তর আফগানিস্তানে মাজার-ই শরীফ। এ সকল বড় বড় শহরগুলো তালেবানদের দখলে।

আফগানিস্তানে দুটি বড় বড় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে। ১. রাজধানী কাবুলের খাজা রওয়াশ। ২. কান্দাহার বিমান বন্দর, এগুলোও তালেবানদের দখলে। রাজধানী কাবুল এবং কান্দাহারের বিমান বন্দর ছাড়াও তালেবানদের নিকট আরো দশটি বিমান বন্দর ছিল।

১. জালালাবাদ বিমান বন্দর ২. হেরাত বিমান বন্দর ৩. ফারাহ প্রদেশে শীন ডান্ডের বিমান বন্দর, এ তিনটি বিমান বন্দর বেশ বড়, এগুলোর মধ্যে বড় ছোট সব ধরনের বিমান উঠা-নামা করতে পারত। ৪. নিমরোজ বিমান বন্দর

৫. গোর বিমান বন্দর ৬. গজনী বিমান বন্দর ৭. খোস্ত বিমান বন্দর ৮. গারদেজ বিমান বন্দর ৯. হেলমন্দ বিমান বন্দর ও ১০ কুন্দুজ বিমান বন্দর।

আফগানিস্তানে দশটি বাণিজ্যিক শহর রয়েছে। যথা ১. কান্দাহার ২. হেরাত ৩. জেরাঞ্জ (নিমরোজ) ৪. জালালাবাদ ৫. খোস্ত ৬. আসাদ আবাদ ৭. কুন্দুজ ৮. মাজার-ই-শরীফ ৯. কাবুল ১০. গজনী। এ সসকল বাণিজ্যিক শহরগুলোও তালেবানদের দখলে ছিল।

বহির্বিশ্বের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগের জন্য আফগানিস্তানে দশটি বাণিজ্যিক গেট আছে। যথা ১. মনের সাথে স্পেন বোল্ডাক ২. পেশাওয়ারের সাথে তরে খাম ৩. তুর্কমেনিস্তানের সাথে তূর গান্ডি ৪. ইরানের মাশহাদ যাহেদানের সাথে জেরাঞ্জ ৫. মিরান শাহ এর সাথে গোলাম খান (খোস্ত) ৭. তাজিকিস্তানের সীমানার সাথে বন্দর শেরখাঁন ৮. দক্ষিণ উজিরস্তানের নিকট বারমাল ৯. বাজোড় এজেন্সীর নিকট মারওয়ারী ১০. উজবেকিস্তানের সীমান্তের সাথে হেরতান বন্দর এসকল বাণিজ্যিক গেটগুলোও তালেবানদের দখলে ছিল।

আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রসিদ্ধ মহাসড়ক

১. চমন কান্দাহেরর মহাসড়ক ১০১ কিলোমিটার ২. কান্দাহার, হেরাত ও তূর গেন্ডীর মহাসড়ক ৬৭৯ কিলোমিটার ৩. ইসলাম কেল্লা ও হেরাত মহাসড়ক ১২৪ কিলোমিটার ৪. কাবুল ও তূর থাম ও জালালাবাদ মহাসড়ক ২৩২ কিলোমিটার। ৬. কাবুল কুন্দুজ শেরখান বন্দর মহাসড়ক ৪০৫ কিলোমিটার। ৭. কাবুল ও মাজার-ই-শরীফ মহাসড়ক ৪৫০ কিলোমিটার।

তালেবান নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের নাম ও বংশ পরিচিতি

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর একটি দ্বীনী ও ইলমী পরিবারের চেরাগ। দীনি খেদমতের কারণে শতাব্দীকাল থেকে তার বংশ সবার কাছে পরিচিত। তার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ওমর। পিতার নাম মৌলভী গোলাম নবী আখুন্দ।

বংশধারা এ রকম– মুহাম্মাদ ওমর ইবনে গোলাম নবী আখুন্দ ইবনে মোল্লা মুহাম্মাদ রাসূল আখুন্দ ইবনে মৌলভী মুহাম্মাদ ইযাজ আখুন্দ।

হুতাক গোত্রের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়টি প্রায় ১০০ বছর থেকে কান্দাহারে বসবাস করে আসছে। মধ্য এশিয়ার ন্যায়পরায়ণ মুজাহিদ শাসক আহ্মাদ শাহ আবদালীর খেলাফতের

রাজধানী কান্দাহারের নূরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর আগে। এই গ্রামেই তার পিতা মাদরাসা ও মসজিদে ইলমে নববীর শিক্ষাদান ও ইমামতির দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। এর আগে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের বংশধর ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তান-এর যাবেল প্রদেশের শাকনাই ও বৈরুত জেলায় বসবাস করত। সেখানে আজও পর্যন্ত তার বংশের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গের নামে একটি কুপ প্রসিদ্ধ আছে।

যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিক ইলম ও ইসলামের খেদমতের কারণে তার পূর্বপুরুষগণ বিশেষ মর্যাদা ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষের অধিকাংশই আফগানিস্তানের দক্ষিণ প্রদেশসমূহ– যেমন কান্দাহার, যাবেল, উরযগানের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। পুরো আফগানজুড়ে তাঁরা (ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্যবহৃত) মোল্লা ও মৌলভী উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বহু আগ থেকেই সাধারণ জনগণের একটি বিরাট অংশ তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক যে কোন সমস্যায় এই পবিত্র খান্দানের বুযুর্গদের কাছে ছুটে আসে এবং সমাধান গ্রহণ করে।

পিতৃহীন বালক

আমীরুল মুমিনীন যখন মাত্র তিন বছরের বালক তখন তার পিতা মৌলভী গোলাম নবী আখুন্দ ৪০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বালক ওমর ছিলেন তার বাবা-মায়ের একমাত্র নয়নমণি। কারণ, তার এক ছোট ভাই ও বড় তিন বোন অল্প বয়সেই আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি শুধু এতীমই নন; বরং এই বংশের একমাত্র প্রদীপে পরিণত। ভাই-বোন আর পিতৃছায়া বঞ্চিত এ বালকটি ছিল তার মায়ের একমাত্র অবলম্বন।

কারও কল্পনায়ও কোনদিন একথা উঁকি দেয়নি যে, এই এতীম বালক একদিন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, লড়াইয়ের ময়দানে বীরত্ব, মাখলুকের খেদমত এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'র ভিত্তিতে 'আমীরুল মুমিনীন' খেতাব লাভ করবে। তাও আবার শুধু নামে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়; বরং বাস্তবিক অর্থেই।

পিতার মৃত্যুর পর তার বড় চাচা মৌলভী মুহাম্মাদ আনওয়ার তাঁর মাকে বিবাহ করেন। তার ঔরসে আল্লাহ তাআলা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরকে মা-শরীক তিনটি ভাই ও তিনটি বোন দান করেন। আলহামদু লিল্লাহ সবাই জীবিত আছেন।[৩] তিনটি ভাই-ই এখন জিহাদী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

---

[৩] এটা লেখকের সময়ের কথা। বর্তমানের কথা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

তার চাচা চারজন। তাঁরা সবাই এখনও জীবিত আছেন। বড় চাচা মৌলভী মুহাম্মাদ আনোয়ারের অধীনে লালিত পালিত হন মুহাম্মাদ ওমর। এখনও পর্যন্ত খান্দানের দেখাশুনার দায়িত্ব বড় চাচার কাঁধেই রয়েছে। বাকী তিন চাচা হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ হানাফী আখুন্দ, হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ জুম্আ আখুন্দ, হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ ওলী আখুন্দ। ওলী আখুন্দ সমাজে পীর সাহেব নামে প্রসিদ্ধ।

আমীরুল মুমিনী-এর সব চাচাই উঁচু মাপের বুযুর্গ। তবে তাদের মধ্যে মোল্লা মুহাম্মাদ ওলী আখুন্দ বিশিষ্ট। তার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় সিজদার হালতে।

খান্দানের সবাই একই পরিবারের অপূর্ব সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করেন। যুবকরা প্রত্যেকে জিহাদের কাজে লিপ্ত। অন্য মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে আফগান ভূমিকে অবিচার, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে মুক্ত করতে অহর্নিশি ব্যস্ত।

শিক্ষা

বালক ওমর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন তাঁর বড় চাচা মৌলভী মুহাম্মাদ আনওয়ারের কাছে। তিনি উরযগান প্রদেশের বৈরুত জেলায় একটি মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। তার আশপাশে সব সময় ছাত্রদের ভিড় লেগে থাকত।

আমীরুল মুমিনীন কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী ফিকহের উচ্চতর জ্ঞান বড় বড় আলেম থেকে অর্জন করেন। (তাদের নাম আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।)

আমীরুল মুমিনীনের শৈশবকাল অতিবাহিত হয় একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় ও ইলমী পরিবেশে। ইলম অর্জনের সুবাদে কিছুদিন তিনি চাচা মৌলভী মুহাম্মাদ জুম্আ আখুন্দ সাহেবের কাছেও অতিবাহিত করেন।

ব্যক্তিগত সম্পদ

সবর ও কানাআতের প্রতীক এই মোবারক খান্দানটি। ইসলামকে সমুন্নত রাখা এবং দীনি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করাই এদের মিশন। মর্যাদা ও পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের মোহ কখনও এই মিশনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এ কারণে শুধু 'আমীরুল মুমিনীন' নয়; বরং তার চার চাচার কারওই ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন সহায় সম্পত্তি– এমনকি থাকার ভাল একটি ঘরও নেই।

আঠারো বছরের যুবক জিহাদের ময়দানে

মুহাম্মাদ ওমরের বয়স তখন ১৮। একের পর এক শিক্ষা বছর পার করছেন তিনি। ১৩৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৮ সন। মুহাম্মাদ ওমর তখন হিদায়া পড়ছেন। ফিকহে হানাফীর সর্বোচ্চ কিতাব। চলতি বছর বাদ দিয়ে শিক্ষা সমাপনের মাত্র দু'বছর বাকী। এমন সময় সারা আফগান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এক অপবিত্র বিপব। রাশিয়ার বুকে জন্ম নেওয়া আদ্যোপান্ত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কমিউনিজম আন্দোলন। ইতিহাসে যা 'ইনকিলাবে ছাওর' নামে পরিচিত।

আফগানিস্তানের জনগণ খুব ভাল করেই আঁচ করেছিল যে, কমিউনিজম যে ভূমিতে প্রবেশ করবে তার ধর্মীয় অবস্থা মারাত্মকভাবে জর্জরিত হবে। কারণ, তাদের সামনে ছিল বুখারা, সমরকন্দ, দাগিস্তান আর তুর্কমেনিস্তানের জীবন্ত ছবি। সুতরাং তারা এ আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য জীবনবাজী রেখে মাঠে নামল। জানবাজ সিপাহীদের এই কাতারে এসে শামিল হল আঠারো বছরের এক টগবগে যুবক। ধর্মীয় মূল্যবোধ আর খোদার দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষে যার অন্তর ভরপুর। তখন তাঁর এক হাতে শোভা হেলালী ঝাণ্ডা আরেক হাতে খালেদী তলোয়ার। আচার-আচরণ আর জিহাদী কর্মকাণ্ডে ইসলামের স্বর্ণযুগ খেলাফতে রাশেদার আলামত স্পষ্ট।

তরুণ এই যুবকের হাত ধরেই আফগানিস্তানে উন্মোচিত হয় ইসলামের পুনর্জাগরণের ধারা। চারদিকে তমসা আর নিরাশার মুহূর্তে তৃতীয় ওমরের ভূমিকা পালন করার জন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে নির্বাচন করেন। তাই এই মহামানব যৌবনের সূচনাতেই আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

এর আগে দীর্ঘদিন থেকে খেলাফতের ছায়া মুসলিম সমাজের মাথার উপর থেকে উঠে গিয়েছিল। ফলে যে বিধানটির গুরুত্ব মুসলমানদের দিল থেকে মুছে গিয়েছিল কিংবা মুছে দেওয়া হয়েছিল এমনকি তার অর্থ ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা পর্যন্ত বদলে ফেলা হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে সেই বিস্মৃত বিধান জিহাদের সবক পড়ানোর জন্য, তাদের অন্তর থেকে জিহাদ বিষয়ক সর্বপ্রকার সংশয় দূর করার জন্য এই মহামানব যৌবনের প্রথম কলি ফুটতেই বেরিয়ে পড়েন জিহাদের ময়দানে। আগ্রাসী শক্তি রুশদের হাত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে।

রোযগান প্রদেশে দুইবার আহত

আমীরুল মুমিনীন কিছু দিন রোযগান প্রদেশের বৈরুত জেলায় রাশিয়ান কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এখানে থাকাবস্থায় পরপর দুইবার তিনি শত্রুর আঘাতে আহত হন।

প্রথমবার আঘাত পান পায়ে। দুশমনের রকেট তার পা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। দ্বিতীয়বার তিনি মেশিনগানের ভয়াবহ হামলার আওতায় পড়েন। তখনও তিনি মারাত্মক আহত হন। মেশিনগানের লাগাতার বুলেট লাগার ফলে তার পুরো দেহ চালনীর ন্যায় ঝাঁঝরা হয়ে যায়। চিকিৎসা চলতে থাকে। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে এক সময় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিলম্ব না করে আবার শরীক হন জিহাদী কাফেলায়।

তার বীরত্ব আর সাহসিকতা দেখে দুশমনরা সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। সম্মুখসমরে তার বীরত্বপূর্ণ হামলার কারণে তিনি ছিলেন রুশদের চোখের কাটা। 'মোল্লা ওমর' নামটি উচ্চারিত হলেই রুশ সেনাদের কলিজায় যেন শেল বিঁধত। এসব কারণে তার চাচার আশঙ্কা হয়, না জানি ভাতিজা কমিউনিষ্টদের কোন গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যায়। কারণ, তিনি যে অঞ্চলে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন, সেটি ছিল কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্রের উর্বর ভূমি। তাই তিনি ভাতিজাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'তুমি কান্দাহারের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জওয়ারী জেলায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে গেরিলা হামলার কেন্দ্র নির্মাণ করের। কারণ, সেখানে এখনও কমিউনিষ্টরা পা জমাতে পারেনি।'

পাঞ্জওয়ারীতেই ছিল সেই মহাসড়ক যা দিয়ে রাশিয়ানদের বিশাল রসদবহর যাতায়াত করত। তা ছাড়া গেরিলা হামলার উৎকর্ষ দেখানোর জন্য অঞ্চলটি ছিল বড়ই উপযোগী।

আমীরুল মুমিনীন জিহাদী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দূরদর্শী চাচার পরামর্শে পাঞ্জওয়ারী জেলার পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়েই তার যুবক সাথীদের নিয়ে রাশিয়ান বলশেভিকদের বিরুদ্ধে একের পর এক হামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর আক্রমণ পরিচালনা এতই নিপুণ ছিল যে, অল্প দিনেই সে অঞ্চলে তিনি একজন সাহসী ও অভিজ্ঞ সমরবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জিহাদ ও মুসলমানদের সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ তাঁকে সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত করে দেয়। তাঁর বংশীয় মর্যাদা, স্বভাবগত শিষ্টাচার আর ময়দানের বীরত্বের ঘটনাসমূহ এলাকার ছোট বড় সকলের মুখে মুখে চর্চা হতে শুরু করে।

তৃতীয়বার আহত ও সুউচ্চ মনোবল

আমীরুল মুমিনীন মোলা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ পার্বত্য অঞ্চলের গেরিলা হামলার সময়ে রাশিয়ানদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তৃতীয়বারের মত মারাত্মকভাবে আহত হন। এতে তার ডান চোখ শহীদ হয়ে যায়। তাঁর কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের বর্ণনা, গুরুতর আহত হওয়ার কারণে মোল্লা ওমরকে কোয়েটার এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারগণ অপারেশন শেষে তাকে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেন। ক্ষত স্থানগুলোতে পানি লাগাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলে দেন, এতে বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কিন্তু ডাক্তারদের নির্দেশনার বিপরীতে মোল্লা ওমর নামাজ ওযু করে পড়তে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন, এই সামান্য ক্ষতের কারণে ওযু ছেড়ে দেওয়া আমার জন্য অসম্ভব। এ সময় তাঁর মা ও চাচা থাকতেন রোযগান প্রদেশে। তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তিনি মাঝে মধ্যে সেখানেও যেতেন।

ষোড়শ রকেট দ্বারা রাশিয়ান ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের প্রবীণ সাথী ও তালেবানের প্রথম সারির সর্বোচ্চ কমান্ডারদের তালিকায় যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কজন হলেন, মোলা মুহাম্মাদ শহীদ, মোলা নেক মুহাম্মাদ শহীদ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডার ফাতিহ কাবিল, হাজী মোলা বুরজান শহীদ, প্রসিদ্ধ কমান্ডার মোল্লা বেরাদার আখুন্দ, মোল্লা ইয়ারানা, মোল্লা আবদুল্লাহ এবং মোল্লা আখূ যাদাহ আখুন্দ।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর তখন মৌলভী মুহাম্মাদ নবী মুহাম্মাদীর দল 'হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী'র আঞ্চলিক গ্রুপ কমান্ডার এবং আর,পি,জি:৭ (ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রকেট) পরিচালনায় খুবই পারঙ্গম। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমীরুল মুমিনীন এক সঙ্গীকে বলেন,

একবার পাঞ্জওয়ারী জেলায় একটি রাশিয়ান ট্যাঙ্ক গোলাবর্ষণের জন্য খুবই উপযুক্ত স্থানে টিলার আড়ালে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে লাগাতার গোলাবর্ষণের ফলে মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হতে থাকে। মুজাহিদদের একটি বড় অংশ ইতোমধ্যে শাহাদাত বরণ করেন। মুজাহিদগণ ট্যাঙ্কটির কারণে খুব বিপাকে পড়ে যান। কোনভাবেই সেটা বিধ্বস্ত করা যাচ্ছিল না। রাশিয়ানরা বড় চাতুর্য্যের সাথে ট্যাঙ্কটি এমন জায়গায় স্থাপন করেছিল, মুজাহিদদের মোর্চা থেকে যেখানটা টার্গেট করা ছিল প্রায় অসাধ্য।

কিন্তু পর্বতসিংহ মোল্লা ওমর কিছুতেই দমবার পাত্র নন। তিনি সংকল্প করলেন, যে কোন মূল্যে ট্যাঙ্কটি বিধ্বস্ত করেই তবে ক্ষান্ত হবেন। লাঞ্চার দিয়ে একের পর এক পনেরটি রকেট ফায়ার করলেন। অবশেষে ষোড়শ রকেটের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মোল্লা ওমরের সংকল্প পূর্ণ করেন। রকেটটি ট্যাঙ্কের গায়ে লাগতেই সেটা ভঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। ট্যাঙ্কটির উপর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত আগুনের ফুলকি দেখা যেতে থাকে। মুজাহিদরা সবাই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেন।

জিহাদ চলাকালীন বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক

জিহাদ চলাকালীন মোল্লা ওমর বা তার বংশের কেউ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশে হিজরত করেননি। বরং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বীরত্বের সাথে লালভল্লুকদের চোখে চোখ রেখে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও বংশীয় বীরত্বের কাহন ইতিহাসের পাতায় লিখতে থাকেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের জিহাদ চলাকালীন সময়ে কালকের মোল্লা ওমর আর আজকের আমীরুল মুমিনীন বহির্বিশ্বে কারও সাথেই কোন ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করেননি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই দীর্ঘ সময়ে শুধু দুই তিন বার মারাত্মক আহত হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য কোয়েটা শহর পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য কমাণ্ডার ও নেতা বছরের কয়েকমাস পর্যন্ত পাকিস্তানে কাটাতেন। আফগান জিহাদের সূত্রে তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ করতেন এবং সমর্থক রাষ্ট্রপ্রধানদের সাক্ষাতে যেতেন। মোল্লা ওমর যেহেতু তখন পর্যন্ত বড় পর্যায়ের কোন কমাণ্ডার ছিলেন না, তাই আফগান ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আর ভবিষ্যৎ বিচারে এ বিষয়টি দ্বীনের জন্য অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হয়। এটাকে আফগান জনগণের বরং সারা দুনিয়ার

মুসলমানদের বড় সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ সারা জীবনের শুধু দুইটি পরিবেশেই দেখতে পেয়েছেন।

এক. দ্বীন শিক্ষার কোলাহলমুক্ত পবিত্র পরিবেশ।

দুই. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ময়দানে আল্লাহর কুদরত ও নসরতবেষ্টিত পরিবেশ।

তিনি যতটা আন্তরিকতা, উৎসাহ উদ্দীপনা ও দূরদর্শিতার সাথে জিহাদের ময়দানে দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর কাটিয়েছেন, তার নযীর অন্য মুজাহিদ ও কমাণ্ডারদের মাঝে পাওয়া দূর্লভ।

আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে একদিকে নিষ্কলুষ ধর্মীয়, জিহাদী এবং গ্রাম্য পরিবেশ থেকে নির্বাচন করেছেন, অপরদিকে বহির্বিশ্বের নোংরা রাজনীতি ও ধর্মের লেবেলে হিটলারস্বভাবের রাষ্ট্রপ্রধানদের সংশ্রব থেকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। এসব কারণেই মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের দেমাগে ইসলামের ওই চিত্রটিই সংরক্ষিত ছিল, যা কুরআন সুন্নায় পরিষ্কারভাবে বিবৃত আছে; যা খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই কুরআনী সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বরকতেই তালিবানদের নিয়ন্ত্রনাধীন বিস্তৃত অঞ্চলসমূহ শত ঝড়তুফান সত্ত্বেও নযীরবিহীন নিরাপত্তার আবাসভূমিতে পরিণত হয়।

বিবাহ ও শিক্ষকতা

আফগানিস্তান থেকে রুশ সেনাদের অপসারনের পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ নিজ এলাকায় ফিরে যান। বয়স তখন একত্রিশ। বিবাহের প্রয়োজন। তাই একটি সাধারণ পরিবারে অত্যন্ত অনাড়ম্বড়তার সাথে বিবাহ কার্যসম্পাদন করেন। বর্তমানে আমীরুল মুমিনীনের দুই সন্তান। ইয়াকুব ও ইদ্রীস। রাশিয়ানদের পতনের পর আফগানিস্তানে কমিউনিজমের সমাধি নির্মিত হয়। রাজধানী কাবুলে গঠিত হয় জিহাদী নেতাদের সরকার। জিহাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন থাকে না। তাই অন্যান্য মুজাহিদের ন্যায় মোল্লা ওমরও ফিরে যান আপন ভূমিতে। সেখানে গিয়ে তার পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য ধর্মীয় শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করেন।

সময় বয়ে চলতে থাকে। কিন্তু জিহাদী নেতাগণ আল্লাহর পক্ষ হতে অর্জিত এ বিজয়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যার্থ হন। শুধু ক্ষমতার লোভে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে লাগলেন। আফগান জাতি তাদের পারস্পরিক লড়াই দেখে জিহাদের মত পবিত্র বিধানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যাপারগুলো মোল্লা ওমরের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। কেনই বা তা হবেন না, তিনি তো অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন শুধু আফগান ভূখণ্ড রক্ষা করার জন্য নয়; বরং ইসলামের পূনর্জাগরণের জন্য। চোখের সামনে সুখস্বপ্ন ভেঙে যেতে দেখে তিনি কিভাবে স্থির থাকতে পারেন। তাই আরেকবার অস্ত্র হাতে নিতে তিনি বাধ্য হন। আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা তাকে বাধ্য করে রক্তের নদীতে ঝাঁপ দিতে। এক ডজনেরও কম মুজাহিদ সাথী নিয়ে এ রক্তপিচ্ছিল পথে তিনি আবার পা বাড়ান।

কার জানা ছিল যে, এই চৌত্রিশ বছরের যুবক দুনিয়ার ইতিহাসে ইসলামের পূনর্জাগরণের ধারক বাহক হবেন। কিন্তু জমিনী জযবার সাথে যখন আসমানের ইচ্ছার মিলন ঘটে, তখন কিছুই অসম্ভব থাকে না। বিগত চার-পাঁচ বছর থেকে এই দুনিয়া ঐশী অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখে আসছে। উপরওয়ালার ক্ষমতা কী করতে পারে, তা দুনিয়ার মানুষ চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করছে। কুফুর ও নিফাকী শক্তির নিষেধাজ্ঞা, কুটকৌশল আর রাশি রাশি ডলার খরচ করা সত্ত্বেও তাহরীকে ইসলামী তালেবানের বীর মুজাহিদদের কাফেলা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমীরুল মুমিনীন সবসময় জিহাদী কাজে লিপ্ত থাকেন। তার নিকটের ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার জন্য উৎসর্গপ্রাণ। অহঙ্কার, আত্মতুষ্টি, মর্যাদার মৌহ কোন কিছুর কল্পনাও করা যায় না তার মাঝে। অত্যন্ত বিনয়ী আর মিশুক স্বভাবের ব্যক্তি তিনি। কারও বিপদ আপদের কথা শুনলে অস্থির হয়ে পড়েন। সাধাসিধে পোশাক, অল্প আহার আর সামান্য বিশ্রামেই অভ্যস্থ তিনি। তিনি যেখানেই অবস্থান করেন সেখানকার লোকেরা তার দীনদারী, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা সততা, উন্নত চরিত্র এবং বিনয়-নম্রতার খুব প্রশংসা করেন। যে কেউ তার সাক্ষাতে আসে তার উন্নত স্বভাব ও সুউচ্চ গুণাবলীর প্রশংসা না করে পারে না।

রাশিয়ানদের সাথে জিহাদের ১৪ বছরে বিভিন্ন দল-উপদল কোন্দল ও আত্মকলহে নুজ হয়ে পড়ে। বুরহানুদ্দীন রব্বানীর নীতিহীন শাসনামলে সামাজিক অস্থিরতা ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। অনেকের দ্বারাই কোন না কোনভাবে পরের অধিকার খর্ব হতে থাকে। এমনকি আপন-পর নির্বিশেষে সমাজের মানুষ একে অপরের বিরোধিতায় মারমুখি অবস্থান নেয়। চারিত্রিক অধঃপতন সর্বনিম্নস্তরে গিয়ে ঠেকে। এমন সময়ও আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের কোন কথায় বা কাজে কেউ আঙুল স্থাপনের সুযোগ পায়নি। নিঃসন্দেহে এটা ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ জিহাদের এক মোজেযা। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের কারামত, আর ইসলামী ইতিহাসের একটি গর্বের অংশ। বিবাদ বিসংবাদের সয়লাবের মাঝেও মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর -আলহামদু লিল্লাহ- সব ধরনের দ্বিধা সংশয় থেকে পবিত্র থাকেন। তিনি সমাজের দরিদ্র, অসহায়দের প্রতি এতটা সহমর্মী যে, তার আশপাশে সবসময় তাদেরকেই রাখেন, যারা বিগত জিহাদে নিঃস্ব হয়েছেন। কারও পা নেই, কারও হাত নেই; কেউ অন্ধ বা কারও দেহ অকেজো। জিহাদে আহত হওয়ার ফলে যারা উপার্জন অক্ষম হয়ে গেছেন মোল্লা ওমরের কাছে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাবান লোক। এসব লোকের ও তাদের পরিবারের ভরণপোষণ, খোঁজখবর রাখা মোল্লা ওমর তার জীবনের মহান দায়িত্ব মনে করেন।

বিজয়ের পর অস্থিরতার শিকার আফগান জনগণ

ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তান গত দুই দশক থেকে বিভিন্ন নাযুক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। বহু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হচ্ছে দেশটি। আফগানের মরুবাসী জনগণ ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছিল রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের শিকার। এই এগার বছরে ১৫ লক্ষ আফগান মুসলিম শহীদ হন। এদের মধ্য থেকে বড় একটি অংশ ইসলামের দুর্দিনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য এসেছিল দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। গৃহহীন হয়েছিল ৩০ লক্ষ আফগান। তারা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পাকিস্তান ও ইরানরে উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে গিয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কয়েক লক্ষ মানুষ হারায় দেহের মূল্যবান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এদের মধ্যে নিষ্পাপ শিশুদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

এ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের আরেকটি কালো অধ্যায়, যার তুলনা হতে পারে শুধু চেঙ্গিজী বর্বরতার সাথে। এ ছিল সেই লাল ভল্লুকদের থাবা, যাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, তারা যেখানে একবার প্রবেশ করে সেখান থেকে ফিরে যাবার নাম নেয় না। যারা মধ্য এশিয়ার অনেক মুসলিম দেশ এক এক করে আস্ত গিলে ফেলেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ তাদের জন্য হিতে বিপরীত হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশ শুধু আফগানিস্তান নয়; বরং এশিয়ার অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার পথ সুগম করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে আফগানিস্তান অতটা উন্নত দেশ নয়। সারাদেশ জুড়ে শুধু পাহাড় আর মরুভূমি। এজন্য পুরো আফগানিস্তানের প্রতি লাল ভল্লুকদের খুব একটা লোভ ছিল না; বরং তাদের টার্গেট ছিল মিঠা পানির ঝর্ণা পর্যন্ত পৌছা এবং সেখান থেকে পুরো দুনিয়ায় প্রভুত্ব কায়েম করা।

এই সুখস্বপ্নই তাদেরকে নিয়ে আসে আফগানিস্তানের প্রস্তরময় ভূমিতে। কিন্তু নিত্যনতুন টেকনোলজি, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী অসহায় আফগান ঈমানদারদের হাতে মারাত্মকভাবে মার খায়। শহীদ জেনারেল জিয়াউল হক, শহীদ জেনারেল আখতার আবদুর রহমান, শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ. এবং নাম না জানা আরও অসংখ্য শহীদের আত্মোৎসর্গ, ঈমানী চেতনা, আল্লাহ তাআলার উপর অবিচল আস্থা ও অনন্য যুদ্ধ কৌশলের কারণে রাশিয়ান বাহিনী যে কতটা বিপাকে পড়ে, তার দৃষ্টান্তমূলক অশুভ পরিণতি সারা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের ভূত কাঁধে সওয়ার হওয়ার পর সুপার পাওয়ার রাশিয়া রিক্ত হস্ত আফগানদেরকে উপাদেয় লোকমা মনে করে গ্রাস করার ইচ্ছায় এসেছিল। ১৪ বছরের ব্যবধানে আহত কুকুরের মত গোঙাতে গোঙাতে এবং ক্ষতের রক্ত চাটতে চাটতে বিদায় নেয়। ইমাম শামেলের শিখানো সবক আবার স্মরণ হয়। এত বিশাল শক্তির অধিকারী হয়েও পুরো দুনিয়ার সামনে হাওয়ায় মিলে যায় তাদের অস্তিত্ব। এক শতাব্দী পূর্ণ না হতেই লেলিনবাদের কুপোকাত হয়।

এই অকল্পনীয় লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের পর ১৯৭৯ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে যখন রাশিয়ান বাহিনীর অপসারণ শুরু হয়, তখন সবার মনে এই আশা জাগে যে, এখন সময় এসেছে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ আর শহীদানের রক্তের ফল ভোগ করার। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কাবুলের সিংহাসনে গাদ্দার নযীবুল্লাহ বসে

ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আফগানিস্তানে লাল ভল্লুকদের নাটের গুরু। পনের লক্ষ্য শহীদের রক্তের ছোপ লেগেছিল তার কপালে। রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধের অবসান হলেও এই গাদ্দারের সাথে মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল অব্যাহত।

ওদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। জেনারেল জিয়াউল হক ও জেনারেল আবদুর রহমান আখতার একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। বড় বড় কয়েকজন জিহাদী নেতার শাহাদাত বরণ ও মুজাহিদদের অভ্যান্তরীণ কিছু কোন্দলের কারণে আফগান জিহাদের ইতিহাসে এটি ছিল একটি দুঃসময়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিশেষ অনুগ্রহে সময়টি কোন মতে পার হয়ে যায়। অবশেষে মুজাহিদ নেতাগণ পেশাওয়ারে সমবেত হন। কাবুলে কীভাবে প্রবেশ করা যায়, তা নিয়ে তারা পরামর্শ করেন । কাবুল থেকে মাত্র কয়েক কিলমিটার দূরে উত্তর আফগানিস্তানে একজন বাহাদুর মুজাহিদ ছিলেন। একজন গ্রুপ কমাণ্ডার। তিনি ছিলেন কর্মচঞ্চল ও সবার কাছে প্রিয়। পেশাওয়ারে অবস্থানরত নেতাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

১৯৯২ এর এপ্রিলে মাসের শেষ দিকের কথা। দুজন জিহাদী নেতা আহমদ শাহ মাসউদ ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের মাঝে কাবুলের ব্যাপারে ব্যাপক মতানৈক্য দেখা দেয়। জিহাদ চলাকালীন সময়েও এই দুই নেতার মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকত। কিন্তু এতদিন সকলের দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ থাকার কারণে এসব মতানৈক্যের প্রভাব অন্যদের উপর তেমন একটা পড়েনি।

আফগান জাতির দূর্ভাগ্য যে, কাবুল বিজয় ও আফগান জিহাদের সাফল্যের প্রথম ধাপ হিসেবে জিহাদী সংগঠনগুলো যেদিন উৎসব পালন করে, সেদিন থেকেই আহমদ শাহ মাসউদ ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের বাহিনীর মাঝে ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি ও সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে আফগান জিহাদের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ও নির্মম অধ্যায়। যখন পনের লক্ষ শহীদের রক্ত নিষ্ফল করে দেওয়ার জন্য দুই নেতা মাঠে নেমে আসেন, তখন দেখতে দেখতে সবার মাঝে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। আফগান জিহাদের বদৌলতে দুনিয়ার অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনে যে ইতিবাচক সাড়া পড়ছিল, তা ধুলোয় মিশে যেতে থাকে। বরং সেগুলোর অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

জিহাদ ও মুজাহিদদের বদনাম হতে থাকে। শতাব্দীকাল পর আরেকবার ইসলামী জাগরণের যে স্বপ্ন দেখা যাচ্ছিল তা শুধুই দুরাশায় পরিণত হয়।

জিহাদ চলাকালীন সময়ে যেসব রাষ্ট্র ও সংগঠন মুজাহিদদের সমর্থক ছিল, তারা চেষ্টা শুরু করল যাতে মুজাহিদদের পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে এমন কিছু না ঘটে, যা লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে গাদ্দারী বলে গণ্য হতে পারে। ইসলামাবাদ, পেশাওয়ার এমনকি হারাম শরীফেও বিশ্ব নেতাদের মাঝে বিভিন্ন আলোচনা হতে থাকে; কিন্তু কোন পদক্ষেপই ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৯২ এর এপ্রিলের পর থেকে আফগানিস্তানের চলমান ঘটনাবলীর কারণে মুসলমানদের হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। নেতৃবৃন্দ একত্র হতেন। সন্ধি আলোচনা হত। তারপর ফিরে যেতেন। সংঘাত অব্যাহতই থাকত। এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে অবস্থানরত ভিনদেশী মুজাহিদগণ শুধু এতটুকু অপেক্ষা করতে থাকেন যে, পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেই তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন। তাদের ব্যাথিত হৃদয়ের উপশম শুধু এতটুকুই ছিল যে, তারা নিজ ঘরে ফিরে যেতে পারবেন। আগত প্রতিটি দিন তাদের আশা-ভরসায় পানি ঢালতে থাকে। আর নেতাদের গদি টানাটানি দুর্যোগ ও অস্থিরতা আরও বাড়াতে থাকে।

গৃহযুদ্ধের জোয়ারে নিরাপত্তাহীন আফগান ভূমি একটি ইসলামী রাষ্ট্র তো হয়ই না; বরং যত্রতত্র চেকপোষ্ট, ট্যাক্স, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, অস্ত্রের জোরে অপরের উপর প্রাধান্যবিস্তার ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাবুলের সিংহাসনে বুরহানুদ্দীন রব্বানী চেপে বসেন। আর রাষ্ট্র পরিচালনার লাগাম ধরেন তারই অধীনস্ত সামরিক বাহিনীর প্রধান আহমদ শাহ মাসউদ। প্রধানমন্ত্রিত্ব গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের ভাগ্যে এলে ক্ষমতার পূর্ণ সময়ে তিনি আপন মন্ত্রণালয় থেকে সামান্য দূরে যাওয়ারও সাহস পাননি। রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় তিনটি প্রদেশ শাসন করতে থাকেন একজন সাবেক সামরিক অফিসার। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কথাই কানে যেত না তার। কয়েকটি প্রদেশ ছিল কাবুল সরকারের অধীনস্ত সামরিক অফিসার আহমাদ শাহ মাসউদের নিয়ন্ত্রনাধীন। একটি প্রদেশ ছিল প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের বাহিনীর একাংশের এক কমাণ্ডারের অধীনে। আরেক কমাণ্ডারের অধীনে ছিল অপর এক প্রদেশ । বাদবাকি কিছু প্রদেশ ছিল বড় বড় নেতাদের

নিয়ন্ত্রনমুক্ত। সেখানে চলছিল স্থানীয় বাহিনীর শাসন। এমন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানকে একটি 'স্বাধীন রাষ্ট্র' খেতাব দেওয়া ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের অবমাননা করার নামান্তর। কান্দাহার, বুলদাক, যাবেল, হেলমন্দ, গজনীসহ আরও কিছু এলাকায় এমন কিছু সামরিক অফিসারের স্বায়ত্ব শাসন চলছিল, যারা নিজেদের মনমত সাধারণ জনগণকে ব্যবহার করতো।

এসব এলাকার চিত্র এতটাই নোংরা হয়েছিল যে নিরাপত্তা বলতে কিছুই সেখানে ছিল না। প্রতিটি উর্ধ্বতন নেতাই সাধারণ জনগণের সম্পদ লুটের চিন্তায় থাকতো। জনগণ তাদের প্রতিনিয়ত নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে ভাবতে শুরু, এমন দুর্বিসহ জীবন লাভের জন্যই কি আমরা ১৫ লক্ষ শহীদের রক্ত ঝরিয়েছি। আমাদের জীবন কি এই নেতাদের করুণার উপরই বেঁচে থাকবে। ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা এই পর্যন্ত পৌছে যে, প্রত্যেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিজেকে সকল আইন-কানুনের উর্ধ্বে আর আশপাশের দুর্বলদেরকে তার আদেশের দাস ভাবতে থাকে।

এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিষ্ঠাবান মুজাহিদের করণীয় ছিল আবার কোমর বেধে মাঠে নামা। জিহাদের আকেরটি অধ্যায়ের সূচনা করা, যার লক্ষ্য হবে কুফরী শক্তিকে প্রতিহত করার পর ক্ষমতালোভী স্বার্থবাজ মুনাফিকদের হাত থেকে ক্ষমতার মসনদ মুক্ত করা এবং জনগণের জানমাল নিয়ে খেলায় ব্যস্ত লোকগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়া। বাহ্যত এ কাজটি সাধারণ কোন কাজ ছিল না। কিন্তু কাজটি যতটা দুঃসাধ্য ছিল সময়ের দাবিতে কাজটির প্রয়োজন ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি। তাই অতিক্ষুদ্র একটি দল এ প্রয়োজনের সর্বোচ্চ উপলব্ধিকে সামনে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে যায়। কারও কল্পনায়ও আসেনি যে সামান্য এই কয়জন মুজাহিদ কোন বড় ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারবেন। এবং চৌদ্দ বছরের যুদ্ধবিধ্বস্ত, গৃহযুদ্ধে জরাজীর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে চরম ভঙ্গুর একটি দেশে সমস্যার এতগুলো স্তর পাড়ি দিয়ে সফল অবস্থানে পৌছতে পারবেন।

কিন্তু দুনিয়া সাক্ষী, ১০/১২ জন যুবকের এ দলটি সমস্যার উৎসমূল নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমাধানের পথও তাদের সামনে স্পষ্ট হয়। তাই উপায়-উপকরণের অভাব, সংখ্যাগত স্বল্পতা এবং পর্বতসম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও খুবই অল্প সময়ে কাবুলের রাজ প্রাসাদে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করে তারা।

একজন যুবক। যিনি ভালো মাপের একজন আলেম ছাড়া কিছুই নন। কর্মজীবনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন শিক্ষকতার মধ্যেই। তিনি একদিন কিতাব পড়াচ্ছিলেন। সামনে ছিল মাত্র ২১ জন ছাত্র। আচানক এক গাড়িচালক তার ক্লাশে প্রবেশ করে। নিজের দাস্তান শোনাতে চায় সে। গাড়িচালকের দৃষ্টিতে ক্লাশ দানকারী ব্যক্তি অনেক বড় আলেম।

চালক বলতে শুরু করে, আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি চেকপোষ্টে আমাকে দাঁড় করানো হল। অন্যায়ভাবে চড়া মূল্যের ট্যাক্স চাওয়া হল। আমি তাদের এক নেতাকে বললাম, এটা কি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের হুকুম? তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অনেকগুলো কুফরী বাক্য বলে ফেলল। কুফরী কথার বিবরণ দেওয়া যদিও কুফুরী নয়; কিন্তু তার সেই জঘন্য কথাগুলো মুখে আনার সাহস হচ্ছে না আমার।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর গাড়িচালকের কথাগুলো শুনে শেষ করেন। সামনে রাখা কিতাবটি বন্ধ করে দেন তিনি। কিছুক্ষণের জন্য গভীর ভাবনায় ডুবে যান। সবাই নীরব, নিশ্চুপ। ছাত্রদের মনে জিজ্ঞাসা, মোল্লা ওমর কী ভাবছেন? সবার তন্ময়তা ভাঙিয়ে মোল্লা ওমর যখন মাথা উঁচু করলেন, চেহারায় তাঁর গাম্ভীর্য্যের ছাপ। মিশুক স্বভাব আর হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তিটির সারা দেহ যেন ক্রোধের আগুনে জ্বলছে। কিছুক্ষণ সবার দিকে তাকিয়ে কয়েকটি কথা বললেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর কিন্তু শান্ত। 'এখন আমাদের জন্য বেঁচে থাকা হারাম। যখন প্রকাশ্যে কুফরী কথা বলা হয়, ইসলামের নিদর্শনাবলীর অবমাননা করা হয়, তখন রাশিয়ান লালভল্লুক আর এই অপদার্থ কমাণ্ডারদের মাঝে কী পার্থক্য?'

কথাগুলো একশ্বাসে বলে শেষ করেন মোল্লা ওমর। ক্লাস তখনই শেষ হয়ে যায়। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর বিলম্ব না করে একটি বৈঠক ডাকেন। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। প্রথম বৈঠকে তাঁর সাথে শুধু পনের জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, আশপাশের কমাণ্ডারদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলা হবে, 'তোমরা তওবা করো, অস্ত্র জমা দাও। অন্যায় চেকপোষ্ট বন্ধ করো।'

কয়েক দিন পর আরেকটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে আশপাশ থেকে প্রায় দেড়শ' জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

একজন সাধারণ মৌলভী থেকে আমীরুল মুমিনীন

সাধারণ একজন মৌলভী। ইতিপূর্বে জিহাদ করেছেন রুশসেনাদের বিরুদ্ধে। মিশকাত পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছে তার। ছাত্র অবস্থায় ময়দানে চলে যান। তাই পড়াশুনার শেষ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়নি। জিহাদের ময়দানে তার এক চোখ ও এক পা শহীদ হয়েছে। বিজয়ের পর পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য শিক্ষাজীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করল আরেকবার ময়দানে নেমে আসতে।

এই মৌলভী সাহেবের নাম মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর। মোল্লা আর মৌলভী তো সমার্থক। তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ওমর। পরবর্তীতে যেসব তালিবানে ইলম এই আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর রেখে ছিল, তারা তাকে নিজেদের আমীর সাব্যস্ত করে। কিছুদিন পর বিশিষ্ট সাধারণ সকলের কাছে তিনি সমাদৃত হন আমীর খেতাবে। এরপর থেকে শুরু হয় বিস্তৃত আন্দোলন। এক পর্যায়ে যখন কাবুল জয় হলে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয় আরেকটি শব্দ। পূর্ণ নাম দাঁড়ায় আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ।

যখন দেশ জুড়ে গৃহযুদ্ধের কারণে আফগানীরা বন্দীদশায় জীবন পার করছিল, চারদিকে বিরাজ করছিল হতাশা আর অস্থিরতা, তখন মোল্লা ওমর ও তাঁর পরিচালিত দল আশার আলো নিয়ে আবির্ভূত হয়। ঘন কালো অন্ধকার রাতে মরু ঝড়ে আক্রান্ত পথিক, রাতভর ধুলিঝড় আর দমকা হাওয়ার ঝাঁকুনি খাওয়ার পর রাতের শেষ প্রহরে পূবাকাশে ঊষার আলো দেখতে পেলে তার মনের অবস্থা যেমন হয়, মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে দেখে আফগানবাসীর মনের অবস্থাও তেমনই হয়েছিল। দুনিয়ার মানুষ সেই বাহিনীকে চেনে 'তালেবান' নামে। তালেবান শব্দটি তালিব'র বহুবচন। আরবী ও ফার্সীতে শিক্ষার্থী অর্থে ব্যবহার হয় শব্দটি। সুতরাং 'তাহরীকে তালেবানের' অর্থ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। যদিও এ দলে সাধারণ মানুষের সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু এ দলের সূচনা ও কর্মমূলে যেহেতু শিক্ষার্থীরাই ছিল এবং রয়েছে, তাই তারা নিজেদের জন্য এ নামটিই বেছে নিয়েছে। সর্বপ্রথম তালেবানরাই গৃহযুদ্ধে লিপ্ত বাহিনীগুলোকে যুদ্ধবন্ধির আল্টিমেটাম দেয় এবং ক্ষমতাসীনদেরকে চাপ দেয় দেশব্যাপী সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য। কিন্তু যখন তাদের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, তখন তারা অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য সেইসব নেতাদের কাছে নির্দেশ পাঠায়, যারা ক্ষমতার

জোরে জনসাধারণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল অথবা গৃহযুদ্ধের ইন্ধন যোগাচ্ছিল।

মোল্লা ওমরের মুখে তালেবান আন্দোলন

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকাল। মধ্য এশিয়ার একটি দেশে দুজন আরোহী মোটর সাইকেলে করে ছুটে চলেছেন। বাহনটিতে দুজন আরোহী। কিছুদিন আগেই তারা কয়েকজন মিলে একটি আলোড়ণ সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন। একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ, একটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। তিনি কাজটি করার জন্য যাদের সহায়তা পেয়েছিলেন তারা সবাই মাদরাসার ছাত্র। সুশীল সমাজের বিশিষ্টজনদের কর্মব্যস্ততা এতই বেশি যে তাদের ফুরসত নেই মানুষের বিপদাপদে এগিয়ে যাবার। আরো কিছু লোক এগিয়ে এসেছিলেন সেই মোটর সাইকেল আরোহীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। তাদের কেউ স্থানীয় ব্যবসায়ী কিংবা স্বচ্ছল কৃষক। তাদের ছোট্ট দলটি গঠিত হয়েছিল মাদরাসার শরীয়াহ বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র, মৌলভীদের নিয়ে। গ্রামের লোকদের জন্য সময়টি ছিল উৎসবের। বিয়ের অনুষ্ঠান, বরযাত্রী চলছে দলবেঁধে; কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির হাইওয়েতে কোন নিরাপত্তা নেই, ডাকাত আর চোরের দলের উৎপাত এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, রাস্তার পাশে মরা লাশ পড়ে থাকলেও তা লোকজনের কাছে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এতটাই স্বাভাবিক যে, কেউ গাড়ি থামিয়ে লাশটিকে কবর দেয়া দূরে থাক, পথচারীরা পর্যন্ত দুবার ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করে না। এহেন পরিস্থিতিতে, যে বিপদের আশঙ্কা ছিল, ঘটলো তা-ই। বরযাত্রীদের দল হাইওয়ে ডাকাতদলের খপ্পরে পড়ল। হতাহতের ঘটনা ঘটল। মহিলাদের উঠিয়ে নেয়া হল অপহরণ আর ধর্ষণের জন্য।

স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের গণ্ডারের চামড়ায় সাধারণত ময়না তদন্তের আগে অনুভূতি হয় না। মাদরাসার একজন মোল্লা এই ঘটনায় ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলেন। তিনি বের হলেন, 'আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার' এর ডাকে, সাথে ছিল মাদরাসার ছাত্ররা, যাদের বলা হয় তালেব। তালেবের বহুবচন 'তালেবান' মানে অনেকগুলো ছাত্র। কিছু মহিলাদের উদ্ধার করা সম্ভব হলো, আবার অনেকে ইতোমধ্যে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গ্রামের লোকজনের আবেদনে যে প্রশাসন নির্বিকার ছিল সেই

প্রশাসনকে বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। কাবুলের শাসক রব্বানীর অনুগত গভর্নর ও তার প্রশাসনকে কান্দাহার প্রদেশের গ্রামের লোকেরা বের করে দিল। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সাথে তারা স্বেচ্ছায় তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তুলে দিল যে লোকটির হাতে তাঁর নাম মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ। যিনি সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিলেন চোর আর ডাকাতদলের হাত থেকে মুসলিম নারীদের ইজ্জত রক্ষা করার ডাকে সাড়া দিয়ে। কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, একা এভাবে এগিয়ে যাবার শক্তি তিনি কোথায় পেলেন? কিভাবে তিনি বাকি লোকদেরকেও সাহসী অগ্রযাত্রার সাথী করে নিলেন? আসুন শুনি তাঁর নিজের জবানীতে, 'তখন আমি মাদরাসায় পড়ালেখা করি, মাদরাসাটি ছিল 'সানজ সার' শহরে, কান্দাহারে। আমার সাথে আরও প্রায় ২০ জনের মত সহপাঠী ছিল। এরপর দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ল, খুন, হত্যা, লুটতরাজ, ডাকাতি এগুলো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, আর দেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল দুর্নীতিবাজ, বাজে সমাজপতিদের হাতে। 'এই সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে' সবচেয়ে আশাবাদী লোকেরাও এমন আশা করা ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি আমি নিজেও তাদের মতই ভাবছিলাম। এরপর নিজেকেই বললাম,

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

'আল্লাহ তাআলা কখনো কাউকে তার শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না'।[৪]

এরপর আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট ছিল, নইলে আমি হয়তো এই বিষয়গুলো ছেড়ে দিতাম। কারণ কোন কিছুই আমার সামর্থের মধ্যে ছিল না।

কিন্তু আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, খাঁটি ভরসা। আর যে কেউ আল্লাহর ওপর এ পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে, তার আশা কখনো হতাশায় পরিণত হয় না। মানুষ হয়তো ভাবতে পারে, কখন এই আন্দোলন শুরু হল? কারা এর পিছনে ছিল? অর্থায়ন কারা করল? পরিচালনা করল কারা? আর নিয়ন্ত্রণ করল কারা? আমি তাদের বলব, এই আন্দোলন তো শুরু হয়েছে সেদিন,

---

[৪] সূরা বাকারাহ : ২৮৬

যেদিন আমি আমার মাদরাসাতে টেবিলের ওপর বইটি ভাঁজ করে রেখে সাথে আরেকজন ভাইকে নিলাম, এরপর আমরা দুজনে মিলে পায়ে হেঁটে জানযাওয়াত এলাকার দিকে গেলাম। এরপর সেখান থেকে আমি একটি মোটরসাইকেল ভাড়া নিলাম। যে আমাকে ভাড়া দিয়েছিলেন তার নাম 'শুরুর'। এরপর আমরা তালুকান এলাকায় গেলাম। আর এভাবেই আমাদের আন্দোলন শুরু হল।

এরপর আমরা এক মাদরাসা থেকে আরেক মাদরাসার ছাত্রদের সাথে দেখা সাক্ষাত শুরু করলাম। ছাত্রদের যে সকল হালকা (স্টাডি সার্কেল) ছিল সেগুলোতে যেতাম। একদিন সকাল বেলায় আমরা একটি 'স্টাডি সার্কেলে' যাওয়ার পর দেখলাম, সেখানে ১৪জনের মতো ছাত্র অবস্থান করছে। এরপর আমি তাদেরকে একত্রিত করলাম আমার চারপাশে, আর বললাম, 'আল্লাহর দীন এখন মানুষের পায়ের নিচে, মানুষ প্রকাশে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা করছে, খারাপ কাজ করছে, আর অপরদিকে যারা দীন মেনে চলার চেষ্টা করছে তারা তাদের দীনকে গোপন করে আছে, আর অসৎ লোকেরা পুরো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে আছে। তারা মানুষের সম্পদ চুরি করে, রাস্তায় তারা মানুষের ইজ্জত হানি করে, খুন করে। এমনকি যদি কারো মরা লাশ রাস্তার ওপর পড়েও থাকে, তাহলে মানুষ নির্বিকার চিত্তে তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যায়। গাড়ি চালিয়ে চলে যায় আর দেখে রাস্তার ওপর একটা মরা পড়ে আছে। কোন লোক যে এসে লাশটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে দাফন করবে তাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমি তাদেরকে আরও বললাম, 'এই রকম জরুরী অবস্থার মধ্যে শুধু পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব না, চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব না। আর এই সমস্যাগুলো স্লোগান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব না, যার পিছনে কোন সমর্থন নেই। আমরা তালেবে ইলম এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওঠে দাঁড়াতে চাই। যদি তোমরাও সত্যি সত্যি চাও আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করতে, তাহলে আমাদের মাদরাসার আঙ্গিনা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আর আমি তোমাদেরকে খুলে বলছি, একটা মানুষও আমাদেরকে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার ওয়াদা করেনি। তাই তোমাদের এরকম মনে করার কোন কারণ নেই, আমরা আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করব আর

বিনিময়ে অন্য কেউ আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিবে, বরং মানুষের কাছ থেকেই অনুরোধ করে আমাদের নিজেদের খাদ্য ও সাহায্য চেয়ে নিতে হবে।'

আমি বলেছিলাম, 'এটা একদিনের কাজ নয়, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরের কাজও নয়, বরং এতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তোমরা কি সেটা করতে তৈরি আছ?'

'গ্রীষ্মের এই দিনগুলো ছিল খুব গরমের। মনে হতো যেন কালো রঙয়ের কেটলীতে কেউ পানি গরম করছে আর আমি তাদেরকে এ বলে উৎসাহিত করতে লাগলাম যে, 'আজ এই রকম পরিস্থিতিতে তোমরা নিজ নিজ কেন্দ্রে বসে থাকতেই বেশি পছন্দ করছো! অথচ তারা সরাসরি আল্লাহর দীনের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর আমরা কিনা দাবী করছি আমরা আল্লাহর দীনের লোক! শরীয়াহর ছাত্র, অথচ আমরা শরীয়াহর সমর্থনে কোন কাজ করছি না।' কাজেই তোমরা বলো তোমরা কি এই কাজগুলো করতে তৈরি আছো? কিন্তু সেই চৌদ্দজনের মাঝে একজনও খুঁজে পাওয়া গেল না, যে এই কাজ করতে তৈরি আছে, তারা বলল, 'জুমার দিনে হয়তো আমরা এই কাজগুলোর কিছু কিছু কাজ করতে পারি।' আমি বললাম, 'তাহলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে কে এই কাজগুলো করবে?' আমি আল্লাহকে আমার সাক্ষী মেনে বলছি, এটাই ছিল বাস্তবতা, আর আমি যাবতীয় ইজ্জতের মালিক আল্লাহর সামনে শেষ বিচারের দিনে এই ঘটনার সাক্ষ্য দিব। আমাদের এই আন্দোলন আল্লাহর ওপর খাঁটি তাওয়াক্কুলের-ই ফল ছিল। কেননা, সেদিন যদি আমি ওই কয়েকজন ছাত্রের ওপর ভিত্তি করে অন্যদের প্রতিও একই রকম ধারণা করে বসে থাকতাম, তাহলে হয়তো আমি নিজেও আমার পড়ালেখায় মন দিতাম। মাদরাসায় ফেরত যেতাম; কিন্তু আমি আল্লাহর নামে যে শপথ করেছিলাম তা পূর্ণ করার দিকে মন দিলাম। আমি যে শপথ করেছিলাম তা পূর্ণ করেছি, আর আল্লাহও আমাকে পরিচালিত করেছেন যেমনটা আজকে আপনারা দেখছেন।

এরপর আমি আরেকটি পাঠশালাতে গেলাম। সেখানে প্রায় সতেরজন ছাত্র ছিল। আমি তাদেরকেও উদ্ভত পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলাম। এবার এই হালকার সতেরজনের সবাইকে পাওয়া গেল যারা আমাদের প্রস্তাবে আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করতে রাজী

ছিল। সবার মাঝে অসাধারণ এক বন্ধন গড়ে ওঠে। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবার প্রতি সবাই ছিল খুব আন্তরিক। মোটকথা, কাজটি ছিল সম্পূর্ন শরঈ ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। তাই এই কাজের শুরু থেকেই আমাকে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরপর আমরা যে একটি মোটর সাইকেল ভাড়া করেছিলাম, সেটিতে চড়ে একের পর এক মাদরাসা, স্কুল ও স্টাডি সার্কেলে ভ্রমণ করতে লাগলাম। আল্লাহর শোকর অল্প সময়ের মধ্যেই তিপ্পান্নজন লোক আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে কাজের জন্য তৈরি হয়ে গেল। এরপর আমি তাদেরকে আগামীকাল দেখা হবে বলে মাদরাসায় ফেরত আসলাম। কিন্তু তারা রাতের বেলায় সবাই একসাথে 'সানয সার' এ এসে হাজির হল। আর এটাই ছিল শুরু। আমাদের পরিকল্পনার বয়স চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই আমাদের কাজ শুরু হলে গেল। ফযরের নামাযের পর সেখানে উপস্থিত একজন বলল, 'আজকে রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশতারা 'সানয সার' এলাকায় প্রবেশ করছে, আমি তাদের সাথে মুসাফাহ করলাম। ওহ! কি কোমল ছিল তাদের হাতের পরশ। পরদিন সকাল দশটার দিকে হাজী বিশর নামক এক ভাই থেকে দুটো গাড়ি চেয়ে নিলাম। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি আমাদের দুটো গাড়ি দিলেন, একটা ছোট কার, আরেকটা বড় কার্গো ট্রাক। এরপর আমরা সবই ছাত্রদের 'কাশক নুখুদ' এলাকার দিকে সরিয়ে নিলাম। বাদবাকি অন্যান্যরাও আমাদের সাথে যোগ দিল। যখন একসাথে অনেক লোক জমায়েত হল, আমরা লোকদের কাছ থেকে অস্ত্র ধার করলাম। আর এভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের প্রতিরোধ আন্দোলন।' তাঁর ব্যক্তব্য শেষ– আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন, বিজয় দান করুন এবং মুজাহিদিনদের সাহায্য করুন। আমিন।

হ্যাঁ, এটাই ছিল আন্দোলনের সূত্রপাত। আমেরিকা ইসলামিক আমিরাতের ওপর হামলে পড়ার আগ পর্যন্ত যা এক ধারায় চলছিল। যখন আমেরিকা এই ইসলামিক রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তারা ইতিহাসকে যেন পাল্টে দিল, তারা সাম্প্রতিক অতীতের এই বাস্তবতাকেও পাল্টে দিতে চাইল। তালেবানদের নাম দেয়া বিদেশী এজেন্ট, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের দেশীয় রক্তপিপাসু দোসর, লুটেরা, হাইওয়ে ডাকাত, খুনী- যারা কিনা যমীনে নিজেদের কর্তৃত্ব ও অনাচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়!!! আরও কত সহস্র পন্থায় অভিযোগ, ধোঁকা, চক্রান্ত করা হল এই ইসলামিক ইমারাহ'র বিরুদ্ধে। যে

সকল লেখক বুদ্ধিজীবী এ ইমারার বিরুদ্ধে তাদের কলমবাজী করেছিল, মিথ্যার বিষ ছড়িয়ে ছিল এরা মূলত বিকৃত মন-মানসিকতার শিকার স্বজাতির গাদ্দার, পরজীবী। সত্যানুসন্ধানী মানুষগণ জানেন, তালেবান কোনদিনই পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের খেলনা ছিল না। এখন আমেরিকা এবং পাকিস্তান সরকার উভয়েই তাদের দিকে এক তীরে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করছে। আর এখন তালেবান সারা দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারাও রাজনীতি বুঝে। তারা আমেরিকানদের ফাঁদে পা দেয় না, মুনাফিকদের ফাঁদে পড়ে না।

আমরা পুনরায় ফেরত যাচ্ছি সেই আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের দিকে, 'কান্দাহারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, দলে দলে তালেবে ইলমদের বহর আসতে লাগল, কান্দাহারের সীমানাবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলো থেকে জনসাধারণ আসতে লাগল, তারাও এই তালেবে ইলমদের কাছে অনুরোধ জানাল যেন তাদের প্রদেশের কর্তৃত্ব নেয়া হয় এবং সেখানেও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা সেই প্রদেশগুলোতে কর্তৃত্ব ও শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়তা করতে লাগলেন। আর এভাবেই, তালিবান ('তালিবান'-'তালেব' শব্দটির পশতু বহুবচন, যার অর্থ ইসলামী শরীয়াহ'র ছাত্রবৃন্দ-) আফগানিস্তানের এক পঞ্চমাংশ অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল, কোন ধরনের লড়াই ছাড়াই, বরং এখানে মানুষের নিরাপত্তা কামনা ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছাই ছিল প্রধান শক্তি। আলেম, মৌলভী, মোল্লাদের সামাজিক মর্যাদার কারণে; শরীয়াহর ইলমের ছাত্রদের প্রতি মানুষের সম্মানবোধের কারণে কোন রকম বড় বাঁধা ছাড়াই তালেবানরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল উত্তরের প্রদেশ, পূর্বে সবদিকে। আর কাবুলের শাসক রব্বানীর কাছে এই খবর পৌঁছেছিল যে, তার প্রতিদ্বন্দী হিকমতিয়ারের লোকেরা নিজেদের কাবুল থেকে পৃথক করে নিয়েছে, তাই তিনি তালেবানদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন অফিসিয়াল অবস্থান ঘোষণা করেননি বরং তিনি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সাহায্য করেন যেখানে মানুষের কাজের জবাবদিহিতা আছে। কিন্তু হিকমতিয়ার তার ফোর্সদের আদেশ করেন যেন তারা তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে।

তাই গযনী এলাকাতে কিছু সংঘর্ষ হল, এরপর উত্তরদিকে এভাবে কাবুলের দিকে একের পর এক এলাকা প্রায় উল্লেখযোগ্য কোন লড়াই ছাড়াই

পতন হতে লাগল। এমনকি বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী যেমন চোর হাইওয়ে ডাকাত দল এরা পর্যন্ত শরীয়াহ ইলমের তালাবাহ বা ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে সংশয়ে ভুগতে লাগল। অন্যান্য দল যেমন, 'ইউনুস খালিস' এরপর 'হক্কানী' ফোর্স বাকতিয়াতে, খোস্তে তাদের ভূমি সমর্পণ করল। সায়াফে অধিকাংশ ফোর্স লড়াই থেকে বিরত থাকলো। নানকারহারের রাজধানী জালালাবাদের লোকজন যখন তালেবানদের সামনাসামনি দেখল, তাদের শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা জানলো, 'আমর বিল মারুফ ওয়াননাহি আনিল মুনকার' এর কথা জানতে পারল, তাদের নিরাপত্তা, হাইওয়ে চোর-ডাকাত নিধনের কথা ইত্যাদি জানতে পারল, তারাও তালেবানদের সমর্থনে এগিয়ে এল। এরপর তালেবানরা কাবুলের কাছাকাছি পৌছে গেল, সেখানে একটি সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ১৫০০ আলেমের উপস্থিতিতে ৩১ মার্চ হতে ৩রা এপ্রিলের সেই বৈঠকে মোল্লা মুহাম্মদ ওমরকে আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবানদের আমীর নিযুক্ত করা হল এবং উপাধি প্রদান করা হল 'আমীরুল মুমিনীন'।

আর সেদিন থেকেই তালেবানদের কাছে শরয়ী আমীর হিসেবে তিনি গৃহীত হয়ে আসছেন আর তাদের মতে তাকে একজন খলীফার যাবতীয় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তালেবানরা কাবুলের সীমান্তে পৌছে গেলেন আর রব্বানীর কাছে কিছু অনুরোধ নিয়ে গেলেন যার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে–

১. শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
২. সরকার হতে কমুনিষ্ট ও তাদের অনুসারীদের অপসারণ করতে হবে।
৩. দুর্নীতি, পতিতালয়, সিনেমা, গান-বাজনা, অশ্লীল ভিডিও ইত্যাদি নির্মূল করতে হবে।

কাবুলের শাসক রব্বানী তালেবানদের সাথে আলোচনার করার জন্য দূত পাঠাতে বললেন, তাই তারা আলেমদের দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোর্সদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন, এমনকি তারা তাদের অস্ত্র সোপর্দ করবেন, মারামারি বন্ধ করবেন আর আলোচনা শুরু করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরেও তারা প্রেরিত দূতদের একটি অংশকে হত্যা করে বাকীদের ফেরত পাঠায়। যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াইশ'জন। এরপর এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার পরে তালেবানদের পক্ষ হতে কাবুল আক্রমণ করা ছাড়া

আর কোন পথই খোলা ছিল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৬তম রজনীতে কাবুলের পতন হল। তালেবানরা ১৯৯৭ সালে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল জয় করল, আর বামিয়ান-আফগানিস্তানে রাফেযিদের কেন্দ্রের পতন হল ১৯৯৮ সালে, আর এর পূর্বে কায়ান উপত্যকা- যার নিয়ন্ত্রণে ছিল (শিয়া) আগাখানি ইসমাইলী সৈন্যরা- এরও পতন হল। আর এখানে তালেবানেরা যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গনীমতের মাল হিসেবে লাভ করল তা গণনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে আহলুস সুন্নাহ গত ৮০০বছরে এই উপত্যকায় কখনো প্রবেশ করেনি। আর এভাবেই মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯৫ভাগ এলাকাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারল– যার শুরু হয়েছিল সেই সেদিনের মোল্লা মুহাম্মদ ওমর (আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন) এবং তাঁর ভাইদের একটি অন্যায়ের প্রতিবাদের থেকে, যখন তারা একতাবদ্ধ হয়েছিলেন একদল মুসলিম নারীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে যাদেরকে অপহরণ করেছিল কিছু চোর আর হাইওয়ে ডাকাতদল।

তালেবান্দের এই আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। ফলে অল্প দিনেই এই আন্দোলন অনেক সাফল্য অর্জন করে। যেসব এলাকায় সামান্য অভিযান পরিচালনার ফলে লোকজন অস্ত্র জমা দিয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করত, সেখানে তালেবানরা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সামনে বাড়তেন। প্রতিনিধিরা ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ সামলাত। এমনি করে ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া এ আন্দোলন ১৯৯৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে কাবুলও জয় করে ফেলে।

এক সময় তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসে ২০টি প্রদেশ, যা পুরো আফগানিস্তানের ৬৬ শতাংশ এলাকা। পরে তারা ৯৫ শতাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলে। যেসব এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে তারা ওই শাসনই বাস্তবায়ন করেন, যার জন্য নিষ্ঠাবান মুজাহিদরা ১৫ বছর রাশিয়ান উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

ইসলামী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, বাইতুলমাল স্থাপন, সর্বসাধারণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অস্ত্রসস্ত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা, দীনদার ও খোদাভীরু লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদে বসানো, সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা দূরিকরণ ও সহনীয় মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ জনগণের

হাতে তুলে দেওয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন তারা। জনগণের নিরাপত্তা সাধনে পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা বিভাগ সুদৃঢ় করণ, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও জেলায় জেলায় আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা, নগর উন্নয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল নির্মাণ ও উন্নত চিকিৎসার সহজলভ্যকরণ, পর্দাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, বিশিষ্ট আলেম ও ধর্মীয় বরেণ্য ব্যক্তিদের থেকে ধর্মীয় দিকনির্দেশনা লাভের জন্য 'উলামা কাউন্সিল' গঠনসহ আরও অনেক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে থাকেন তারা। এ ছিল আফগান জাতির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। এই দৃশ্য দেখে দেখে মানুষ দলে দলে তালেবানের পতাকা তলে সমবেত হতে থাকে।

আন্দোলন আগে বাড়তে থাকে। এ সময় আহমাদশাহ মাসউদ, বুরহানুদ্দীন রব্বানী, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার ও জেনারেল রশীদ দোস্তমসহ বিভিন্ন জন ক্ষমতা দখলের জন্য যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখেছিল তা থেকে বিরত থাকার আহ্বান করা হয়। কিন্তু তালেবানের এ আহ্বান শুধু অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। এরাই পরবর্তীতে কাবুল ও অন্যান্য স্থানে নিরাপরাধ মানুষদেরকে গনহারে হত্যা করে।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাশিয়ান উপনিবেশের সময় আফগান জনগণের তত সম্পদ ধ্বংস হয়নি, যতটা বিগত চার বছর কাবুল ও তার আশপাশের এলাকায় গৃহযুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়। অথচ মোহান্ধ এসব নেতার অনুভূতিতে জনসাধারণের ক্ষতির বিষয়টি কোন আচরও কাটেনি।

এরপর যখন কাবুল বিজিত হয় এবং প্রায় ৩০টি প্রদেশ তালেবানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তখন উত্তর দিকে অভিযান চলতে থাকে। অপর দিকে শিয়া সংঘটন হিযবে ওয়াহদাত এর কারীম খলীলী এবং অপসারিত সাবেক সরকারের সেনাপ্রধান আহমাদশাহ মাসউদ যারপরনাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকেন। তালেবানের সামনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাঁধা।

এই দীর্ঘ সময়ে জায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাচের পুতুল মুসলিম ঘরনার কিছু নেতা ও পশ্চিমা মিডিয়া তালেবানের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এমনকি পাকিস্তানের কিছু ইসলামী দলও এর শিকার হয়। একটি নিরেট ইসলামী রাষ্ট্রের সংগ্রামী ছাত্রদেরকে আমেরিকার এজেন্ট বলে প্রচার করতে থাকে তারা। ইন্ডিয়ার কথা ছিল, এরা রক্ত পিপাসু মিলিশিয়া। ক'দিন পরই এরা কাশ্মীর অভিমুখে রওয়ানা হবে। ইরানও

তালেবানকে সেকেলে ও গোঁড়া আখ্যা দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডকে জনগণের কাছে খারাপভাবে ফুটিয়ে তোলে। মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো আফগানিস্তানকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করতে থাকে।

বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানের ভূমিকাকেও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। বলা হয়, তালেবানের নেতৃত্ব বরং তাদের সহযোদ্ধা হল পাকিস্তানের রেগুলার আর্মি। পাকিস্তানের ইমেজ নষ্ট করার জন্য তারা তালেবানের সহায়তা করছে। বরং পৃষ্ঠপোষকতা করে তারা ইরান ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর জন্য হুমকির উপকরণ আবিষ্কার করছে।

এসব প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের রাষ্ট্রগুলো থেকে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। যেহেতু আফগানিস্তানের অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে পাকিস্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাবিত হতে থাকে, সেজন্য এ অপপ্রচারও চালানো হয় যে, পাকিস্তান আফগানিস্তানের সহায়তা করে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। পৌঁছতে চায় প্রাকৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর পর্যায়ে।

পাকিস্তান কর্তৃক আফগানিস্তানের প্রতি সহায়তা যদি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কারণে হয়ে থাকে, তবে এতে কারও মনঃকষ্টের কারণ নেই। (একথা সবার কাছে স্পষ্ট যে, ইসলামী বিশ্বে পাকিস্তানের অবদান উন্নতির চাবিস্বরুপ– উভয় রাষ্ট্রের মাঝে বাণিজ্যিক চুক্তি, পারস্পরিক সহায়তা প্রদান ও গ্রহণ।) এ ধরণের প্রশ্ন আফগানিস্তানের পরিবর্তনশীল কাঠামোকে ভেঙে খান খান করার জন্যই করা হয়। কিন্তু তালেবানের আন্দোলন ছিল সার্বজনীন। বর্ণ বা জাতির কোন ভেদাভেদ তারা করেনি। আন্দোলনে পারসিক, উজবেক, পশ্তুসহ বিভিন্ন জাতির সদস্য ছিল যথেষ্ট পরিমাণ। উত্তর আফগানিস্তানের জনগণও ক্ষমতা পূজারী কোন প্রতিনিধির অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। নজিবুল্লাহর ফাঁসির দায়ভার জাতিসংঘের। কেননা, বিজয়ের সময় যখন ইউএনও'র সকল কর্মকর্তা আখের গোছানোর জন্য সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তখন তারা নজীবুল্লাহকে কেন সেখানে ছেড়ে আসে? কমিউনিষ্টদের তল্পিবাহক নজীবুল্লাহর মত পাপিষ্ট শাসককে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখাই কি পনের লক্ষ শহীদের রক্তের প্রাপ্য?

নারী শিক্ষার নামে যে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়, তা ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন ও খোড়া যুক্তি। কমিউনিষ্টদের হাতে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার

করার প্রয়োজনকে কে অস্বীকার করবে? মেয়েদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী শিক্ষিত করে তোলার জন্য এর বিকল্প ছিল না।

আরেকটি অপপ্রচার হল 'তালেবান পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর জন্য হুমকি'। অথচ তালেবান নেতাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, এই আন্দোলন শুধু আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহনশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। সংখ্যালঘুদেরকে ইসলামের অনুপম দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হবে।

এমন পরিষ্কার কথার পরও যদি প্রোপাগাণ্ডা অব্যাহত থাকে, তবে তা সমাধানের কোন পথ তালেবানের কাছে নেই। তালেবানের পক্ষ থেকে এতটুকু আবেদন করব, যদি রাশিয়া, ভারত, ইরান ও অন্যান্য রাষ্ট্র অপসারিত সরকারকে সহায়তা ও অস্ত্র যোগান বন্ধ করে দেয়, তবে খুব শীঘ্রই আফগানিস্তানে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তালেবান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন শুরু করে দিবে।

পরিশেষে ফকীরুল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠকদের প্রতি আবেদন হল, এ পর্যন্ত অবস্থা দৃষ্টে প্রমাণিত হয়েছে যে, তালেবানের আন্দোলন কোন বহিরাষ্ট্রের দালালী নয়। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এমনটি হওয়া সম্ভবও নয়। অবশ্য অর্থনৈতিক দৈন্য ও অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে তাদের নেওয়া যে কোন পদক্ষেপ যদি কোন রাষ্ট্রের পক্ষে চলে যায়, তবে এতে তাদের কিছু করার নেই।

তালেবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠা

আফগানিস্তানের মুজাহিদীন বিগত পনের বছর রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন ত্যাগ ও কোরবানীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যা ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। জিহাদের বরকতে রাশিয়ান বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করলেও নেতারা জনগণকে তাদের মনোপুত কোন ব্যবস্থা উপহার দিতে ব্যর্থ হয়। অথচ সে জন্যই পনের লাখ শহীদ নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আফগান জনসাধারণ খেলাফতে রাশেদার আদলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আশা লালন করত। চোখের সামনে আপনজনের ত্যাগ ও কোরবানীকে নিষ্ফল হতে দেখে নেতাদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির উপর

তাদের আফসোস হতে থাকে। নেতাদের কাছে তাদের যে আবদার ছিল 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক' তা পূরণ হল না। বরং সর্বত্র শুরু হয়ে যায় নিরাপত্তাহীনতা ও লুটতরাজ।

এই নাজুক পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের এক বীর পুরুষ মর্দে মুজাহিদ জনগণের আশা পূরণ করার জন্য সামনে অগ্রসর হন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে রনাঙ্গণে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। আস্তে আস্তে সেই তরুণ মুজাহিদগণও তার পাশে জড়ো হতে থাকেন, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা যাদের আত্মত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই লৌহমানব, যিনি আজ থেকে চার পাঁচ বছর পূর্ব পর্যন্ত অপরিচিত ছিলেন, আজকের বিশ্ব তাকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর নামে চেনে। তার সহযোদ্ধা মুজাহিদরা যেহেতু (তালেবান) মাদরাসাপড়ুয়া, তাই দলের নাম রাখা হয় তালেবান ইসলামী আন্দোলন। আন্দোলনের সূচনা হয় কান্দাহারের শহর স্পেনবুলদাক এর একটি গ্রাম 'মেওয়ান্দ' থেকে।

দল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে খুনখারাবী-লুটতরাজের সমাপ্তি ঘটানো এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। দেখতে দেখতে এই আন্দোলন আল্লাহ তাআলার সাহায্যে বিপ্লবের আকার ধারণ করে। তাদের বিজয়ধারা দেখে সাহাবায়ে কেরামের কথা নতুন করে মনে পড়ে। যেসব এলাকা তালেবানের হস্তগত হয়েছে, সেখানে ইসলামী খেলাফত কায়েম করা হয়েছে। মূলত আফগান নাগরিকদের আন্তরিক বাসনা ছিল এটাই। এ কারণেই তালেবান আন্দোলন সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অবশেষে ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তালেবান কাবুল জয় করে। সাম্রাজ্যবাদীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। সত্যের বিজয় নিশ্চিত হয়।

তালেবান যখন কাবুলের আকাশে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেয়, ঠিক তখনই তাগূত ও কুফরী শক্তিগুলো তালেবানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তালেবানকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করতে থাকে। ইন্টারন্যাশনাল ও প্রাচ্যের তাগূতী শক্তিতে প্রভাবিত কিছু মিডিয়ার অপপ্রচারের ফলে তালেবানের প্রতি বিশ্ববাসী সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। কেউ প্রচার করতে থাকে যে, এই বিপ্লবের মূল হচ্ছে আমেরিকা দ্বিতীয়বার কাবুলে জহীর শাহীর ন্যায় সেক্যুলার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কেউ বলে, এসব কিছু পাকিস্তান পিছনে থেকে করাচ্ছে। ওখানে কোন তালেবান নেই। মূলত

আই.এস.আই-এর জোয়ানরা যুদ্ধ করছে। মোট কথা, যার মুকে যা আসে, সে তা-ই উগলে দিতে থাকে।

আমি নিজ চোখে যা দেখেছি

আমি তখন ছিলাম লাহোর। কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা আফগানিস্তানে গিয়ে স্বচক্ষে সেখানের অবস্থা দেখে আসব। তারপর জনগণকে অবহিত করব। সফরে আমার সঙ্গে ছিলেন হাফেজ রুজী খান, নিলাগুমুদ আশরাফিয়া ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শহীদ শের মুহাম্মাদ দরবেশ।

১৯৯৫ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর বাসযোগে লাহোর থেকে পেশাওয়ারের উদ্দেশে রওয়ানা হই। পরদিন সকালে পেশাওয়ার পৌঁছি। সেদিন রাত কাটাই পেশাওয়ারেই। সকালে কোইটি টিল রোড ধরে খোস্তের উদ্দেশে রওয়ানা হই। ২৯ শে সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের প্রদেশ খোস্তের প্রাদেশিক কেন্দ্রে পৌঁছি। বের হয়ে পড়ি খোস্ত শহর দেখার জন্য। আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই সেখানে জনজীবন স্বাভাবিক। সাধারণ লোকদেরকে আমরা তালেবান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সদ্য প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তারা আমাদেরকে জানায়, তালেবানের ইসলামী খেলাফত আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত। পন্যের দাম কমে গেছে। সবখান থেকে লুটতরাজের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন আমরা ঘুমাতে পারি নিশ্চিন্তে।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা গভর্নর হাউসের দিকে গেলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা রীতিমত হতবাক। আমাদের ধারণা ছিল গভর্নর হাউস শত শত তালেবানের পাহারা বেষ্টিত থাকবে। আমরা তো পাকিস্তানে গড়ে ওঠা মানসিকতা নিয়ে এমন চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু সেখানকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। পাকিস্তানে যা কল্পনাও করা যায় না। অল্পবয়সী এক মাদরাসাপড়ুয়া মুজাহিদ গভর্নর হাউসের প্রধান ফটকে পাহারা দিচ্ছিল। কেউ হাউসের ভিতর প্রবেশ করতে চাইলে ছাত্রটির অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। আমরাও তা-ই কউলাম। প্রথমে তার কাছে গেলাম। প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। হাস্যোজ্জল চেহারায় আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল সে।

গভর্নর হাউসে আগে থেকে অনেক বিলাসী জীবনোপকরণ বিদ্যমান ছিল। সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সুগন্ধিও ছিল। কিন্তু সেগুলোর প্রতি কর্মকর্তাদের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। যখন বের হয়ে আসছিলাম, তখন আমাদের হৃদয় তালেবানের প্রতি সীমাহীন মুগ্ধ। আমাদের পাকিস্তানী হতাশ অন্তরগুলো এক ঐশী আনন্দে পুলকিত হল। এ যুগেও যদি কোন জাতি তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে চায়, তবে তা সম্ভব।

পাঠক! নিশ্চয় বুঝেছেন যে, পাকিস্তানীদেরকে যে হতাশা গ্রাস করে রেখেছে, অন্তত তা আমাদের অন্তর থেকে তা দূর হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস, যদি আফগানীরা সংশোধন হতে পারে, তবে আমরাও নিশ্চয়ই পারব।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি খোস্তের দক্ষিণে অবস্থিত কেন্দ্রে চলে গেলাম। সেখানকার ইনচার্জ মাওলানা আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ কউলাম। তিনি খুবই মিশুক প্রকৃতি এবং অনুপম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা কউলাম, কোন্ কোন্ দেশ থেকে আপনাদেরকে সহায়তা করা হচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাহায্যেই চলছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহর দ্বীনের বিজয়। ইসলামের পতাকা সমুন্নত করা। যদি আল্লাহ তাআলা সাহায্য না করতেন, তা হলে আমরা আমেরিকা ও রাশিয়ার সাহায্য নিয়েও কিছু করতে পারতাম না। এখানেই আমাদের ও প্রতিপক্ষের মাঝে পার্থক্য। আমাদের সাথে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আছে। প্রতিপক্ষের কাছে তা নেই। এজন্য তারা মাখলুকের কাছে প্রার্থনার ঝুলি খুলে ধরেছে।

আমরা গভর্নর হাউসে তিন দিন অবস্থান করার পর আমরা মাওলানা আবদুর রহমানের কাছে থাকলাম দুই সপ্তাহ। সেখান থেকে আমাদেরকে অন্য এক স্থানে পাঠানো হয়। খোস্ত শহর থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৫ কিলমিটার। নাম নাদের শাহ কোট জেলা। সেখানে আমরা কয়েক জন মাদরাসাপড়ুয়া মুজাহিদদের সাথে অবস্থান কউলাম। আমরা পৌঁছতেই নাদের শাহ কোটে এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানকারী এক ভাইয়ের কয়েক জন সাথী মুহাম্মাদ আগা আওলখত্বে'র দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা গেলেও আমরা অন্যদের সাথে রয়ে গেলাম। কিছুদিন পর আমাদেরও ইচ্ছা হল আওলখত্বের দিকে

যাওয়ার। ইচ্ছা পাকা করে ফেললাম। কিন্তু যাওয়ার একদিন আগে পাকিস্তান থেকে আমার এক আত্মীয় এবং আমার সফরসঙ্গী শের মুহাম্মাদ শহীদে'র দুই ভাই এলেন। গভর্নর হাউস থেকে আমাদের কাছে সংবাদ পাঠানো হল, আপনাদরে মেহমান এসেছেন। তারা খোস্তের গভর্নর হাউসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা সন্ধ্যায় ট্রাকযোগে খোস্তে পৌঁছলাম। দেখা গেল তারা সেখানে বসে আছেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে আলাপ কউলাম। সকালে আমাদের প্রিয় সাথী মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দ জীপযোগে কান্দাহার থেকে আমাদের কাছে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, আমরা আওলখত্ব চাহার আসিয়াবে যাব। তোমরা যাবে কি?

আমরা বললাম, কেন যাব না? এসেছিই তো জিহাদ আর আফগানিস্তানের অবস্থা দেখতে। আমাদের কথা শুনে কমাণ্ডার মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদা খুবই খুশী হলেন।

সিদ্ধান্ত হল, অন্য কেউ আসার আগ পর্যন্ত আমাদের একজন কেন্দ্রে থেকে যাবেন। আমরা রুযীখানকে রেখে গেলাম। জীপ ও ট্রাকযোগে আমরা রওয়ানা হলাম। কেউ জীপে আরওহণ করল, আর কেউ রাস্তায় যে গাড়ী পেল তাতেই চড়ে বসল। এদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যখন আমরা গাড়ীতে চড়লাম, তখন শের মুহাম্মাদ ও গেরিলা কমাণ্ডার মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদা ড্রাইভারের পাশের ছিটে বসলেন। আমি ছাদে আরওহণ কউলাম। সীটে অবশ্য জায়গা ছিল। কিন্তু চিন্তা কউলাম, কমাণ্ডার সাহেবের পাশে একই সীটে বসা ঠিক হবে না। এতে তিনি অশ্বস্তি বোধ করতে পারেন।

কমাণ্ডার সাহেব গাড়ির চালকের সাথে কতাবার্তা বলছিলেন। চালক তালেবান আন্দোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। সে বলল, আপনারা কোন্ কোন্ রাষ্ট্র থেকে সহায়তা পাচ্ছেন?

কমাণ্ডার সাহেব বললেন, আমরা আল্লাহ তাআলার সহায়তায় চলছি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সহায়তার প্রয়োজন নেই। আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করা।

এই জওয়াব শুনে গাড়িচালক খুব খুশী হল। বলতে লাগল, উপরের ছাত্র ভাইটিকেও নীচে ডেকে আনুন। কেননা তিনি রাতে পাহারা দিয়েছেন। সীটে বসলে সামান্য হলেও আরাম বোধ করবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

এ কথা বলে চালক গাড়ি থামাল। শহীদ শের মুহাম্মাদ আমাকে ডেকে বললেন, নীচে এসে সীটে বসুন। কেননা, আপনি গভীর রাত পর্যন্ত পাহারা দিয়েছেন।

চিন্তা কউলাম, আদেশ মান্য করাই সর্বোচ্চ আদব। কাজেই নেমে এসে সীটে বসলাম। গাড়ী চলছিল। হঠাৎ গারদীজ শহরের দুই কিলমিটার আগে এক চেকপোষ্টে আমাদের গাড়ী থামান হল।

মাদরাসাপড়ুয়া একজন ছাত্র এগিয়ে এল। দুঃখপ্রকাশ করে বলল–

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা তল্লাশী নিতে বাধ্য। তাই দয়া করে আমাদের পক্ষ থেকে এমন আচরণে মনক্ষুণ্ন হবেন না।

তল্লাশী শেষে আবার গাড়িও সামনে চলতে লাগল। শহরের কাছাকাছি পৌছলে গারদীজ বাজার নজরে পড়ে। গারদীজ শহরে যখন পৌছলাম, তখন দুপুর। আমরা সেখানেই দুপুরের খাবার খেলাম। বিল পরিশোধের জন্য যখন আমাদের কমাণ্ডার মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদা কাউন্টারের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আমি মনে মনে বলছিলাম, যে খাবার আমরা খেয়েছি, তার বিল হবে সাত আটশ পাকিস্তানী রুপী। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, মাত্র দেড়শ রুপী লাগল।

চিন্তা করুন, এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির তুলনায় আমাদের পাকিস্তানের দ্রব্যমূল্য কত বেশী?

খাবার খেয়ে লোগরের দিকে রওয়ানা হলাম। রাতটা লোগর শহরের একটি হোটেলে কাটালাম। পরামর্শ কউলাম, রাতে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না?

কমাণ্ডার সাহেব বললেন, রাতের বেলা। কে শত্রু আর কে বন্ধু জানা নেই। পাহারা দিতেই হবে। একেক ঘণ্টা করে পাহারার দায়িত্ব ভাগ করে নিলাম। পালাক্রমে পাহারা দিয়ে রাত শেষ হল। সকালের নাশতা উক্ত হোটেলেই সেরে নিলাম।

এরপর রওয়ানা হলাম চাহার আসিয়াবে'র দিকে। আমাদের কিছু সাথী ছিল লোগরের মুহাম্মাদ আগা জেলায়। আগে সেখানে গেলাম। এ সময় চাহার আসিয়াবে যুদ্ধ চলছিল। এক দুই দিন মুহাম্মাদ আগায় অবস্থান কউলাম। এরপরে চাহার আসিয়াবে'র দিকে রওয়ানা হলাম।

চাহার আসিয়াব পৌছে দেখতে পেলাম সড়কের দুই পাশে মোর্চা বানানো। এসব মোর্চা থেকেই যাত্রাপথে লোকদের থেকে অন্যায় ট্যাক্স

আদায় করা হত। কখনও গাড়ী ছিনতাই হয়ে যেত। অস্ত্রের জোরে পর্যটকদের মালামাল লুণ্ঠন করা হত। আরও অগ্রসর হয়ে দেখি রাস্তার সর্বত্র যুদ্ধের ছাপ। স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত ট্যাংক, গাড়ী এবং লাশ পড়ে আছে। সাথীদের থেকে শুনেছি, সাবেক সরকার অপসারিত হওয়ার সময় বারুদভর্তি সুড়ঙ্গ তৈরী করে রেখে যায়। যার ফলে এই গাড়ী, ট্যাংক ও আহমাদশাহ মাসউদের অনুসারীরা ধ্বংস হয়েছে। এ সময় অনেক তালেবান মুজাহিদও অন্যদের মত শহীদ হয়েছেন।

চাহার আসিয়াব বাজারে পৌঁছতেই তোপের গোলার আওয়াজ কানে আসতে থাকে। সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা কউলাম, কাদের পক্ষ থেকে গোলা ছোড়া হচ্ছে? তারা বলল, মাসউদের পক্ষ থেকে গোলা ছোড়া হচ্ছে।

আমি কমাণ্ডার সাহেবকে বললাম, আমি আওলখত্ব ছঙ্গে নাবিশতা যাচ্ছি। তিনি বললেন, চা পান করে তবে যাও।

এরপর চাহার আসিয়াব কমাণ্ডার সাহেব আমাদেরকে চা পান করালেন। চা পান শেষে আমি ও কয়েকজন সাথী আওলখত্বের দিকে পা বাড়ালাম।

প্রথম দিকে আমি দুই দিন শুকনা রুটি খেয়েছি। এতে আমি এই ভেবে আনন্দিত ছিলাম যে, আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, তার দ্বীনের বিজয়ের জন্য শত্রুর সাথে লড়াই করছি। সুতরাং যদি এক মাস বরং এক বছরও শুকনা রুটি খেয়ে থাকতে হয়, থাকব। কোন সমস্যা নেই। কেননা, মুজাহিদের জন্য ধৈর্য্য, অল্পেতুষ্টি, সাহস, আল্লাহর ভয়, সাথীদের সম্মান প্রদর্শন ও উঁচু হিম্মত থাকা আবশ্যক। এগুলির সাথে যদি চলতে না পারি তবে প্রকৃত সওয়াব পাওয়া যাবে না। কেননা, কোমল পানীয়, সুস্বাদু খাবার এবং অন্য সব ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করে শুধু জিহাদের নিয়তেই বের হয়ে এসেছি। আমাদের সর্বদা ধৈর্য্য ও অল্পেতুষ্ট থাকতে হবে। যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন।

চাহার আসিয়াবে আমরা প্রায় তিন মাস শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করি।...

শত্রুর পক্ষ থেকে প্রায় বার দশেক আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়। আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আমরা শত্রুর প্রতিটি হামলাকে প্রতিহত করি।

একদিন চাহার আসিয়াবে আমাদের একসাথী মাগরিবের আযান দিচ্ছিলেন। এমন সময় শত্রুর গোলা এসে তার শরীরে লাগে। আযান অসম্পূর্ণই থেকে যায়। (তিনি শাহাদাত বরণ করেন।)

এর দুইদিন পর আমাদের এক বুযুর্গ কমাণ্ডার মুহাম্মাদ আগা– যিনি সুদর্শন, চরিত্রবান ও বাহাদুর ছিলেন– তিনিও গোলার আঘাতে মারাত্মক জখম হন। আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে চাহার আসিয়াব ক্লিনিকে পাঠিয়ে দিই। সেখানে তাকে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে লোগার পাঠানো হয়। সেখানকার দায়িত্বশীলরাও .... চিকিৎসায় ত্রুটি করেননি। কিন্তু প্রিয় এই কমাণ্ডার মুহাম্মাদ আগা শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পর তাকে বিমানযোগে কান্দাহার প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়।

আমাদের দ্বিতীয় কমাণ্ডার মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদা ছিলেন মুহাম্মাদ আগা সাহেবের স্থলাভিষিক্ত। মুহাম্মাদ আগা সাহেবের শাহাদাতের পর সাথীদের দায়িত্ব মুহিব্বুল্লাহ সাহেবের হাতে সেপার্দ করা হয়। চাহার আসিয়াবে আমাদের সাথীরা দীর্ঘ সময় শত্রুর মোকাবেলা অবস্থান করেন। এজন্য তাদের ছুটি কাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়। শহীদ মুহাম্মাদ বুরজান কমাণ্ডারের কাছ থেকে কান্দাহার যাওয়ার অনুমতি পান। তিনি তাকে বিমানে যাওয়ার আবেদন পত্রে সাক্ষরও করে দেন। এভাবে ছুটি নিয়ে চার জন সাথী কান্দাহার চলে যান। তাদের মধ্যে আমার সাথী শের মুহাম্মাদ দরবেশও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কান্দাহারে আমাদের এক বড় কমাণ্ডার ইজ্জতুল্লাহর কাছে পৌছেন। মৌলভী ইজ্জতুল্লাহ কিছু দিন আগে চাহার আসিয়াবে বোমা বিস্ফোরণে একটি পা হারান। এ কারণে তিনি কান্দাহার থাকতেন। সে সময় কমাণ্ডার সাহেবের সেবার জন্য আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (হাফিযাহুল্লাহ)ও আগমন করেন। আমার সাথী শের মুহাম্মাদও মোল্লা ওমর (হাফিযাহুল্লাহ)-এর সাথে দেখা করেন। তিনি খুব খুশী হন।

শহীদ শের মুহাম্মাদ দরবেশ বলেন, আমি মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (হাফিযাহুল্লাহ)-কে বললাম, আমি আপনার সাথে দেখা করার জন্য এসেছি।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ বললেন, আমি এমন কি হলাম যে আমার সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন?

মোল্লা ওমরের সাথে সাক্ষাতের কয়েকদিন পরই আমার সাথী কান্দাহার থেকে ফিরে আসেন। ফিরে আসতেই আমি তাকে বললাম, চলো, আমরা পাহারা দিই। সে বলল, ঠিক আছে।

রাতে আমি তাকে বললাম, ভাই তুমি ঘুমাও। কেননা, তুমিও খুব ক্লান্ত। আমি একাই পাহারা দেব। সে বলল, আমিও পাহারা দেব।

এভাবে পাহারা দিতে দিতে রাত কেটে গেল।

সকালে আমি শহীদ শের মুহাম্মাদকে বললাম, আমাকে লাহোর যেতে হবে। তুমি যাবে কি না? সে বলল, আমি যাব না। আপনার যেতে হলে একাই চলে যান।

কমাণ্ডার সাহেব ও সাথীর অনুমতি নিয়ে ওয়াগান (মালগাড়ী)-যোগে চাহার আসিয়াব থেকে লোগার, লোগার থেকে টয়োটাযোগে খোস্ত পৌঁছলাম। খোস্ত থেকে সোজা পেশাওয়ার এলাম। পেশাওয়ার যখন পৌঁছি, তখন রাত। গেট বন্ধ ছিল। আমরা উচ্চ আওয়াজ বললাম, গেট খোলো।

পাহারাদার বলল, তোমাদের পরিচয় কি? বললাম, আমরা তালেবান। চাহার আসিয়াব আওলখত্ব থেকে এসেছি।

পাহারাদার গেট খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। আগে নামাজ আদায় করে নিলাম। এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

চাহার আসিয়াব থেকে আসার সময় আমার সাথী শের মুহাম্মাদকে বলে এসেছিলাম, দেখ, এখন যুদ্ধের সময়। আল্লাহ না করুন, যদি কোন অঘটন ঘটে যায় তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে চিঠি মারফত জানাবে।

প্রিয় পাঠক! সে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করেছে। তাকদীর কী! যখন পেশাওয়ার পৌঁছি, তখন শহীদ শের মুহাম্মাদ ও আরও দুই সাথী মারাত্মক আহত হয়। এ সময় আমি পেশাওয়ারে, আর আমার প্রিয় সাথী ময়দানে রক্তে রঞ্জিত।

তখন পেশাওয়ারে আখিলো ক্যাম্পে একটি কনফারেন্স চলছিল। উদ্দেশ্য, লোকদেরকে তালেবান আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের পরবর্তী করণীয় নির্ণয় করা। কাবুলের প্রধান বিচারপতি মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাকিব বলেন, এখানও জিহাদ পূর্বের ধারাবাহিকতায় চলছে। সুতরাং আপনাদের সকলের দায়িত্ব হল, তালেবানকে সহায়তা করা। ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ অব্যাহত রাখা।

লাহোর পৌঁছবার কিছুদিন পর একটি চিঠি এল। চিঠিটা পাঠিয়েছে কোয়েটা থেকে শহীদ শের মুহাম্মাদ। যেহেতু আমি তাকে কোন সমস্যা হলে জানাতে বলে এসেছিলাম, তাই সে চিঠিখানা পাঠিয়েছে।

চাহার আসিয়াবে শহীদ শের মুহাম্মাদ ও আরও ২১ সদস্য একটি ভারী গোলার আঘাতে মারাত্মক জখম হন। তিনি আহত হয়েছিলেন ১৯৯৫ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে। ঘটনাস্থল থেকে তাকে বিমানযোগে কান্দাহার, কান্দাহার থেকে এ্যাম্বুলেন্সযোগে কোয়েটায় পাঠানো হয়। রাত দশটার এ্যাম্বুলেন্স কোয়েটায় পৌঁছে। শহীদ শের মুহাম্মাদের সাথে আমার আরও দুই সাথী আহত হয়েছিল। সবমিলে ২১ জন হতাহত হয়। কিন্তু উল্লিখিত তিন জন ছিল লেখকের ঘনিষ্ট বন্ধু। তিন সাথীরই পা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ট্যাঙ্কচালক সেপনগুল ও মির্জা খানও ছিলেন। তাদেরকে কোয়েটার এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি শহীদ শের মুহাম্মাদের চিঠি হস্তগত হলেই কোয়েটার উদ্দেশে রওয়ানা হই।

এর আগে মাওলানা আবদুজ জাহির সাহেব আমাকে স্থানীয় একটি মাদরাসার শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব দেন। সাথীদের সংবাদ শুনে আমি দুই হাজার টাকার চাকুরী রেখে সাথীদের খেদমতে হাজির হই। বিশদিন তাদের খেদমত করার পর বিশেষ প্রয়োজনে লাহোর আসতে হয়। তাদের অনুমতিই নিয়ে আমি লাহোর চলে আসি। সাথীদের সেবার জন্য আমি একজন লোক ঠিক করে আসি। ভাই শের মুহাম্মাদ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে কান্দাহারের এক জলাশয়ে পড়ে শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে সে।

শাহাদাতের কিছুদিন আগে শের মুহাম্মাদ বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। জামা-কাপড়ও ব্যাগে ভরেছিল। এটা ছিল তার দুই বছরের মধ্যে প্রথম বারের মত বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু আল্লাহর চাওয়া ছিল অন্য রকম। ভাই শের মুহাম্মাদ কফিনে করে বাড়ি গেলেন। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়া ছেড়ে প্রকৃত বাসস্থানে চলে যান তিনি। কিন্তু বদ নসীব লেখক এখনও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় রয়ে গেছি। যদিও একবার গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলাম। কিন্তু শাহাদাত লাভ হয়নি। এজন্য আজ আমি লাহোর আশরাফিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওরায়ে হাদীস সমাপনী বর্ষের ছাত্র। আমার দিলের একান্ত কামনা, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে শাহাদাত নসীব করেন। আমীন।

অত্র প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু আমি তাদের কাতারে এখনও শামিল হতে পারিনি। তারা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, এখনও এমন তরুণ রয়েছে, যারা ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজের প্রাণ নিয়ে খেলতে জানে।

এখানে আমি একটি ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করব। আমি যখন জিহাদের জন্য বের হই, তখন খুবই অসুস্থ ছিলাম। বিশেষ এক রোগে আক্রান্ত

ছিলাম। সে জন্য হাজারো কিসিমের ওষুধ খেয়েছি। কোন কাজ হয়নি। কিন্তু যখন জিহাদের জন্য বের হই, তখন আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই।

আদর্শ জীবন পথে

দীর্ঘ ১১বছর ধরে লাল ভল্লুকদের নাকানি-চুবানি খাওয়ানোর পর যখন এই দীর্ঘ জিহাদের ফলাফল প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং আফগানীরা বিজয় নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করতে থাকে ঠিক, তখনই গোত্রীয় লড়াই, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক যুদ্ধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। ধারাবাহিক ছয় বছর পর্যন্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে তারা। কোনমতে টিকে থাকা আফগানিস্তান অস্তিত্ব রক্ষার হুমকিতে পড়ে। বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের এলাকায় রাজত্ব কায়েম করে রাখে। পুরো দেশের উপর কোন দলেরই নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অন্যায়-অপরাধ বাড়তেই থাকে। জনসাধারণ চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়। লোকজন রাশিয়া বিরোধী হয় ঠিকই, কিন্তু মাদক ও অন্যান্য নেশার দ্রব্য ব্যাপকতা লাভ করে। হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। হত্যাকারীকে পাকড়াও করার কেউ ছিল না। সরকারী কর্মচারীদের নজরে ভালো কিছু পড়লেই তারা তা লুট করত। চেকপোষ্ট থেকে আদায় করা হত অন্যায় ট্যাক্স। 'আইন' বলতে ছিল না কোন কিছুই। সচেতন লোকজন সীমাহীন পেরেশানীতে।

সমকক্ষ বা উন্নত রাষ্ট্রের দিকে নজর পড়লে ঈর্ষা জাগত। এই নাযুক পরিস্থিতিতে মাদরাসার পনের জন ছাত্র ময়দানে নেমে আসেন। রুশ বিরোধী জিহাদে তারা শরীক ছিলেন। তারা শপথ করেন, আপন জাতিকে সঠিক পথে এনেই তবে ক্ষান্ত হব; সকলকে এক পতাকার নীচে জড় করব; সর্বত্র ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করব; জনসাধারণকে জুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দিব। নতুন একটি আদর্শ আফগানিস্তানের ভিত্তি স্থাপন করব।

প্রথমে তারা একই মতাদর্শের ভাইদেরকে একত্র করে আলোচনায় বসেন। পরবর্তী বৈঠকে তাদের সংখ্যা দেড়শতে পৌছে। জনগণের সমস্যা নিয়ে তারা একটি দীর্ঘ জরিপ দেন। সবার আগে কান্দাহারের জনগণকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তারা একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যেদিন সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিনই সেটি কান্দাহারের গভর্নর হাউস এবং অন্য

বড় বড় সরকারী অফিস ও ভবন দখল করে। সরকারী কর্মকর্তাদেরকে অপসারণ করে আল্লাহ তাআলার বিধানের উপর আমল শুরুর ঘোষণা দেয়। সংগঠনটির লোকজন যখন শরয়ী আইন বাস্তবায়ন শুরু করেন তখন থেকে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে থাকে। সর্বত্র নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

কান্দাহারের এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা তাদেরকে দাওয়াত দিতে শুরু করে। যেহেতু তারা সকলে মাদরাসাপড়ুয়া ছাত্র ছিলেন, তাই তারা কোন রাজনৈতিক নাম ব্যবহার না করে শুধু তালেবান শব্দই ব্যবহার করেন। শব্দটি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কান্দাহারে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তালেবানরা অন্যান্য প্রদেশের প্রতি অগ্রসর হতে থাকেন। যেদিকেই তারা অগ্রসর হন, জনগণ তাদের হাতে অস্ত্র সোপর্দ করে। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে তাদের মিশনে যোগদান করে। দেখতে দেখতে তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পরিণত হয়।

তালেবানের সংখ্যাবৃদ্ধির দৃশ্য দেখে বুরহানুদ্দীন রব্বানী, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার, আহমাদশাহ মাসউদের অনুসারীরা যখন তাদের সাথে যুক্ত হওয়ার আশা ব্যক্ত করে, তখন তালেবানরা স্পষ্ট করে ঘোষণা দেন যে, তারা মৌলিক চারটি কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য এসেছে–

১. দেশের ভেতর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

২. শরয়ী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

৩. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ করা।

৪. বিদেশ থেকে আসা (মুহাজির) মুজাহিদদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে তাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা।

যখন তারা আফগানিস্তানের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করেন এবং অনুভব করেন যে, জনগণ তাদের নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করছে, তখন তারা নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ঘোষণা দেন। এরপর অন্যান্য মাদরাসার ছাত্ররা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (হাফিজাহুল্লাহ)-এর নেতৃত্বে একত্র হতে শুরু করে। এদের সংখ্যা একসময় ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

'তালেবান' গোত্র ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দলবদ্ধতা ও লড়াইকে খতম করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে।

তারা যে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতেন, সেখানকার সাধারণ জনগণের হাতে অস্ত্র থাকতে দিতেন না। সমগ্র লোকালয় নিরস্ত্র করে ফেলতেন। শান্তি

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই সাথে তারা শরয়ী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে বিচারক নিযুক্ত করেন। সকল সমস্যার কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ফয়সালা হতে থাকে।

এতদিনে যেহেতু আফগানিস্তানের নব্বই শতাংশের অধিক এলাকা তালেবানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, সেহেতু সর্বত্রই শরয়ী আইন চালু হয়ে যায়।

সমাজ অস্ত্রমুক্ত হয়েছে; শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আফগানিস্তানের সর্বত্রই শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; জনগণের মামলা মোকাদ্দমার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে হানাফী অনুযায়ী করা হচ্ছে– তালেবান কর্তৃক এমন আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পেলেই আমরা জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা সে দেশে গিয়ে হাযির হই।

এর আগেও আমি কাবুল ও অন্যান্য এলাকায় গিয়েছি। কিন্তু এবারের কাবুল আগের মত নয়। এখন চারিদিকে মানুষের মাথায় পাগড়ী আর টুপি। চেহারায় নূরানী দাড়ি। রাস্তা-ঘাটে বোরকা ছাড়া কোন মহিলা নজরে পড়ে না। বাজার, দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন ভেজাল নেই। রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত, মাসআলা-মাসায়েল, আখলাক ও নৈতিকতার সংক্রান্ত আলোচনা, জিহাদী সঙ্গীত, তালেবানের বিজয়ের খবর, ইসলামী ইতিহাসের বিবরণ ইত্যাদি প্রচার করা হয়।

আমরা আফগানিস্তানে ভিন্ন এক পৃথিবী অবলোকন করছি। মাত্র বিশ থেকে পয়ত্রিশ বছরের যুবকরা যে ভারী দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন। সব দায়িত্ব এসব যুবকই পালন করে। সরকারের পক্ষ থেকে যে হুকুমই ঘোষণা হয়, জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে তা পালন করে।

মানবাধিকার সম্পর্কে তালেবানের বক্তব্য হল, আমরা মুসলমান। সুতরাং খেলাফতে রাশেদার নীতিমালার আলোকে যে সব নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হত, আমরা সেগুলোই বিশ্বাস করি। সেগুলো বাস্তবায়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়ে আমরা এক চুলও নড়তে প্রস্তুত নই। তাদের বিকৃত চিন্তা-ভাবনা আমরা বিশ্বাস করি না।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে তালেবানের অবস্থান খুবই রক্ষণশীল। তাদের বক্তব্য হল, শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠানগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কেননা, কমিউনিষ্টদের হাতে প্রণীত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

বহাল রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যুদ্ধ পরবর্তী এই নাযুক পরিস্থিতিতে হুট করে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে ফেলাও অসম্ভব। তাই আপাতত স্কুলগুলো বন্ধ থাক। আমরা কখনই নারীশিক্ষার বিরোধী নই।

এই মুহূর্তে গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন করে শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজও এগিয়ে চলছে।

এরপর শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞ ও প্রবীণ আলেমদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। তারা যে পরামর্শ দিবেন, সেটাই বাস্তবায়ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। তার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত বিষয়াদিও থাকবে।

'নারীদেরকে উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে তোলা দরকার' একথা তালেবান অস্বীকার করে না। অবশ্য অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখতে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ। তারপরও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, যে সিদ্ধান্ত দিবেন, সেটাই কার্যকর করা হবে।

তালেবান নেতৃবৃন্দ বলছেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, ইরান ও অন্য দেশগুলির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। খুব শীঘ্রই আমরা ওআইসি'র সদস্য দেশগুলোকে তালেবানের ইসলামী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আবেদন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে তালেবানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি পাঠাবে।

কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা হাসান বলেন, সাধারণ জনগণ জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এত সহায়তা করবে এবং আমাদের যেকোন নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন, একথা আমরা ভাবতেও পারিনি। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তালেবান সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছে, একথা ভেবে হয়তো সাধারণ জনগণ শুকরিয়া আদায় করছে।

কেন্দ্রীয় শুরা কমিটির সদস্য মাওলানা এহসানুল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, আফগানিস্তানের অবস্থা ছিল এমন যে, লোকজন ভয়ে আসরের পর ঘর থেকে বের হতে সাহস করত না। হত্যা, লুণ্ঠন, অরাজকতা ছিল ব্যাপক। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এতটা শুধরে গেছে যে, এখন যদি কোন মহিলা রাত বারটায়ও গহনা পরিধান করে বের হয়, তবুও কোন সমস্যা নেই। ... যদি সে সম্পূর্ণ নিরাপদ না হয়, ... তা হলে আমার হাত কেটে ফেলব।

মাওলানা এহসানুল্লাহ শহীদ রহ. বলেন, যখন তারা খোস্ত গিয়েছিলেন তখন হিন্দুরা তাদের গলায় হার পরিয়ে দিয়েছিল। তালেবান নিয়ন্ত্রিত সব এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের নিরাপত্তা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এটা আমাদের অন্যতম দায়িত্বও বটে।

তালেবানের এক প্রতিনিধি মোল্লা এহসানুল্লাহ বলেন, রাশিয়ার পতনের পর মুহূর্তেই আফগানিস্তানে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওস্তাদ বুরহানুদ্দীন রব্বানী, ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, আহমাদশাহ মাসউদ, জেনারেল দোস্তমদের ক্ষমতা দখলের লড়াই জিহাদী শক্তিগুলোর বদনাম রটিয়েছে। কিন্তু তাহরীকে ইসলাম তালেবান কার্যত ইসলামী বিধান চালু করে দেখিয়েছে। জিহাদ বিরোধীদের সমুচিত জবাব দিয়েছে।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মোল্লা আবদুস সামাদ বলেন, যখন থেকে তালেবান ক্ষমতা হাতে নিয়েছে, তখন থেকে আর রাতে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। তালেবান সরকারের পুলিশকে এ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যদি কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখা যায়, তা হলে পুলিশ তাকে তৎক্ষণাৎ বিচারকের কাছে সোপর্দ করতে পারবে। এগুলি সবই ইসলামী ব্যবস্থাপনার বরকত। তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে এখনও কোন চুরির ঘটনা ঘটেনি। বরং এর আগে যারা চুরি করেছিল, তারা চুরির মাল সব ফেরত দিয়েছে।

এর আগে হত্যাকাণ্ড ছিল দৈনন্দিনের ব্যাপার। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর মাত্র তিনটি হত্যা সংক্রান্ত মামলা আদালতে এসেছে। বিচারক শরয়ী বিধান অনুযায়ী হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। এরপর জনসম্মুখে তাদেরকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী দণ্ড কার্যকর করা হয়।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নতুন কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। সর্বত্র নাপিতদেরকে নবীজীর প্রিয় সুন্নাত দাড়ি মুণ্ডিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। দাড়ি কাটার অপরাধে কাউকে কোন শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। অধিকাংশ লোকই দাড়ি রেখে দিয়েছে।

পুলিশী চেকপোস্ট সবই তালেবানের অধীনে। সেগুলোতে যারা কাজ করেন, তারা সেচ্ছাসেবক। কোন বেতন গ্রহণ করে না। ২৫ বছর বয়সী তথ্যমন্ত্রী মোল্লা আমীন খান মুত্তাকী বলেন, কান্দাহারে 'সদায়ে শরীয়ত'

(শরীয়তের কণ্ঠ) নামে তালেবান একটি রেডিও স্টেশন চালু করেছে। সেখান থেকে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, শরয়ী বিধান কার্যকর করার সংবাদ, একত্ববাদের কবিতা, সঙ্গীত, দীনী অন্যান্য বিষয় প্রচার করা হয়।

কান্দাহার ও কাবুলে কোন নারী কণ্ঠে কোনকিছু সম্প্রচারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রোগ্রামগুলো ফার্সি ও পশতু এই দুই ভাষায় প্রচার করা হয়।

সরকারী উদ্যোগে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' এর শাখা খোলা হয়েছে। এতে উলামায়ে কেরাম ও তালেবান মিলে জনসাধারণকে দীনের দাওয়াত ও ইসলামী বিধিবিধান চালু করার উপকারিতা ও বরকত শুনিয়ে থাকেন। খারাপ কাজের ক্ষতি ও শাস্তি সম্পর্কে মানুষদেরকে সচেতন করেন।

মোল্লা মুহাম্মাদ রব্বানীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে প্রায় ষোল লাখ মুসলমান শাহাদাত বরণ করে। ঘর ছাড়া হয় লক্ষ লক্ষ মুসলমান। এসব জেহাদের উদ্দেশ্য একটিই ছিল; যাতে আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যুদ্ধ থামতেই কিছু ক্ষমতালোভী ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপরীতে কুফরী ব্যবস্থা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু আফগান জনগণ নিজেদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও ঐক্য সংরক্ষণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংকল্প করে যে, শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তারা শরীয়ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে লড়াই অব্যাহত রাখবে।

এখন চোখের সামনে তালেবান এই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করছে। ইসলামী বিধান কার্যকর করার বরকত প্রমাণ করছে। স্পষ্ট হচ্ছে যে, বিকৃত জীবন ব্যবস্থা সংশোধনের অনুপম পদ্ধতি রয়েছে ইসলামে।

আফগানিস্তানে কদিন ঘুরে অন্তরে খুব আনন্দ অনুভব করছি যে, এতদিন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার শুধু কথা বই-কিতাবে পড়েছি; উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের মুখে শুনেছি। যে স্বপ্ন বুকে লালন করতাম, তা আজ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। একেবারে সবার সামনে। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের দেশেও [পাকিস্তানে] এটা দেখার তাওফিক দান করেন। আমাদেরকেও যেন সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করার নেওয়ামত প্রদান করেন। আমীন।

ইতিহাসের আয়নায় আফগান জিহাদ

১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়টা দুনিয়ার অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। কারণ, রাশিয়া তার অদম্য শক্তি নিয়ে উন্নতি ও সফলতার উচ্চশিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। ভূমণ্ডল রেখে নভোমণ্ডলের উপগ্রহের দিকে যেতে শুরু করেছিল ক্ষমতার রশি। অস্ত্রের প্রাচুর্য ও শক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কার তাদেরকে এতটাই ক্ষমতালোভী করে তুলছিল যে, ইচ্ছা হলেই তারা যেকোন রাষ্ট্রকে অধীনস্থ করে ফেলত। দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করার নেশা আমেরিকা ও রাশিয়াকে সকল নৈতিকতা ও মানবিকতা জলাঞ্জলি দিতে শেখায়।

এ সময়ই আমেরিকা ভিয়েতনামকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। সেখানে তারা মারাত্মক প্রতিরোধের শিকার হয়। হাজার হাজার লাশ ফেলে নতুন কোন রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখান থেকে ফিরে যায়। কোন কোন রাষ্ট্রে তাদের উদ্দেশ্যে সফলও হয়। আমেরিকার লোলুপ দৃষ্টি আফগান ভূমির প্রতিও প্রসারিত হয়। কিন্তু তারা জানত যে, শক্তি দিয়ে আফগানভূমিকে কব্জায় আনা সম্ভব নয়। তাই সরাসরি যুদ্ধের পরিবর্তে ধোঁকা ও প্রতারণার পথ বেছে নেয়। দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে আমেরিকা নিজেদের অবস্থানকে এত মজবুত করে যে, রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কার্যত সেসব দেশের সম্পদ থেকে আমেরিকা উপকৃত হতে থাকে। যেহেতু আমেরিকার এই বর্ধনশীল অবস্থান সুপার পাওয়ার রাশিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল, তাই রাশিয়া উপসাগরীয় দেশগুলোর তেল সম্পদকে কব্জা করার জন্য আফগানিস্তানে সরাসরি ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাস্তা ধরে ওমানের রাজধানী মাসকাটসহ অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেননা, আধা দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করা সত্ত্বেও রাশিয়া সমুদ্রাঞ্চলের সীমা থেকে বঞ্চিত ছিল।

অন্যদিকে আফগানিস্তানের তিন দিকে রাশিয়ার সীমান্ত মিলিত। রাশিয়া কর্তৃক আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ইসলামী অবস্থান থেকে বের করার পর আফগানিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে তারা কুটনৈতিক সম্পর্ককে এতটা জোরদার করে যে, ওসব রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা রাশিয়ার গোলামে পরিণত হয়। যাবতীয় ব্যবসায়ী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় রাশিয়ার সাথে। দীর্ঘ

পঞ্চাশ বছর ধরে শিক্ষার নামে আফগান যুবকদেরকে মানসিকভাবে গোলাম বানিয়ে রাখা হয়। তাদের চিন্তাচেতনা বিকৃত করার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে কোন ত্রুটি করা হয় না। বড় বড় শহরের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সেখানকার লোকজন নামে মাত্র মুসলমান ছিল; বাস্তবে ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকরা ধর্মহীন হয়ে বসেছিল। সরকার ও সেনাবাহিনী শুধু রাশিয়ার গোলামে পরিণত হয়েছিল, এমনই নয়; বরং তারা তাদের চোখের ইশারায় উঠত, বসত। রাশিয়ার জন্য আফগানিস্তানে ঢোকা কোন ব্যাপারই ছিল না। যতটুকু বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তা ছিল পাকিস্তানের পক্ষ থেকে।

১৯৭৬ সালে রাশিয়া আফগানিস্তানে সেনাবাহিনীর প্রবেশ করিয়ে দেয়। এর আগেই আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম দেশের পরিস্থিতি দেখে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী মাহমুদ রহ. বলতেন, এক ছাত্র রাশিয়া থেকে শিক্ষালাভ করে আফগানিস্তান ফিরে আসে। তার পিতা তাকে বিবাহ করতে বলেন। তার পছন্দের কেউ আছে কি না, তাও জিজ্ঞাসা করেন। তখন শিক্ষিত ছেলেটি জওয়াব দেয়, বাইরে যাওয়ার কি প্রয়োজন? অন্য মেয়ের তুলনায় ঘরের মেয়ের ব্যাপারে ভালো জানাশোনা থাকে। তাই বোনের সাথেই বিবাহ করিয়ে দাও।

তার পিতা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বলে, এসব হল ধর্মীয় কুসংস্কার। পিতা বললেন, আচ্ছা আগামীকাল কথা হবে। পিতা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের একত্র করে তাদের সামনে তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করেন। সে আগের জওয়াবেই অটল থাকে। তখন পিতা সবার সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা। তা না হলে আমি তাকে সেদিনই হত্যা করে ফেলতাম।

মোটকথা জিহাদ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনও তা প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যায়। মোল্লা শোবাযাদ, মোল্লা মুজাদ্দেদীসহ অন্যান্য বড় বড় আলেমদেরকে কারাগারে বন্দী করে।

১৯৭৬ সালে আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর সরাসরি আক্রমণ উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনগণকে ভাবিয়ে তোলে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে জিহাদের ঘোষণা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত দিক-নির্দেশনার জন্য পাকিস্তানের আলেমদের সাথেও যোগাযোগ রাখা হয়।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুফতী মাহমুদ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী, শাইখুল হাদীস মাওলানা আবদুল হক আকুরাখাক, পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., তরজমানে আহলে সুন্নত মাওলানা গোলাম গাউস হাজরাবী ও পাকিস্তানের অন্যান্য উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে ফতোয়া প্রদান করেন যে, এই মুহূর্তে আফগান উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনগণের উপর রুশ বাহিনী ও ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ।

জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে চকয়াদগার, পেশাওয়ার, শিরানাওয়ালা, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, করাচী ও মাতলাউল উলূম কোয়েটা'য় জিহাদ শীর্ষক কনফারেন্স আয়োজন করে উলামায়ে কেরামের সংগঠন। সেখানে তারা বলেন, এই মুহূর্তে আফগান জনগণের উপর জিহাদ ফরজে আইন ও পাকিস্তানের জনগণের উপর ফরজে কেফায়া।

তাঁরা আরও বলেন, এখন মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল মুজাহিদদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। এ সময় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, পাকিস্তানের অধীনে একটি জিহাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুদীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ হাজার হাজার শহীদ সেই শামিল হন এবং অক্লান্ত মোজাহাদায় সংগঠনটি টিকিয়ে রাখেন।

জালালুদ্দীন হক্কানী বলেন, জিহাদ শুরু হয় সাধারণ পিস্তল দিয়ে। এরপর গেরিলা আক্রমণ করে শত্রুদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। এভাবে ধীরে ধীরে জিহাদের আমল অগ্রসর হতে থাকে। আফগানিস্তান ঈমানী তাগিদে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিল না।

লক্ষ লক্ষ মুহাজির নিজের ঈমানের জযবায় আয়েশের জিন্দেগী ছেড়ে ময়দানে চলে আসে। যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে উলামায়ে কেরামের হাতে হাত রেখে জিহাদের উপর বাইয়াত নেন।

রুশ বাহিনী আফগানীদের প্রতিরোধের মুখে দিশেহারা হয়ে যায়। রাশিয়ার অস্ত্রের শক্তি জিহাদী জযবার সামনে অকার্যকর হয়ে পড়ে। নিরস্ত্র মুজাহিদদের ঈমানী শক্তির কাছে রুশ বাহিনী লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে কুকুরের মত মরতে শুরু করে। কোন প্রকার সৎকারবিহীন লাশের স্তুপের উপর পেশাব করতে থাকে কুকুর আর গাধা। মুজাহিদদের নাম শুনলেই ওরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়তে থাকে। যারা আফগানিস্তান দখল করার সুখস্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বড় অসহায় হয়ে পড়ে।

সারা বিশ্বের মুজাহিদ ও পাকিস্তানের মাদরাসাছাত্ররা আফগান মুজাহিদদেরকে সম্ভাব্য সবরকমে সহায়তা করে।

মুফতী মাহমুদ রহ. আফগানিস্তানের সকল উলামায়ে কেরামকে জিহাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেন। অবশেষে প্রায় ১৪ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে অন্তত ১০ লাখ জীবন কুরবানী এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করে রুশদের হাত থেকে স্বদেশ মুক্ত করেন। শুধু এটুকুই নয়; বরং সোভিয়েত ইউনিয়ন নামকেই দুনিয়ার মানচিত্র থেকে মুছে দেন তারা। ফলে ১৯৮৮ সালে রাশিয়া জেনেভা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এতে তারা ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করে।

১৫ ফেব্রুয়ারী একটি ঐতিহাসিক দিন। এ দিনে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে রাশিয়া কোন দেশে প্রবেশ করলে সেখান থেকে বের হওয়ার নাম নিত না, সেই রাশিয়া আফগানদের হাতে পর্যদুস্ত। সুপার পাওয়ার রুশ বাহিনী মুজাহিদদের হাতে অপদস্থ হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাচ্ছে।

রুশ সেনাদের চলে যাওয়ার পর যারা ক্ষমতা দখল, তাদের কার্যক্রম জাতির কোন উপকারে আসেনি। মুজাহিদদের বাধার মুখে জহীরশাহ দাউদ, হাফিজুল্লাহ আমীন, নূর মুহাম্মাদ তরকী, বাবর নজীবুল্লাহও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। ১৯৯২ সালে রাশিয়ানরা সমরাস্ত্রসহ আফগানিস্তান মুজাহিদদের হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বড় কষ্টে জাতিসংঘের মাধ্যমে নিরাপত্তা চেয়ে জান বাঁচানোর উপায় বের করেন তারা। কাবুলে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঁচ মাস দেশ পরিচালনার পর মুজাহিদদের পরামর্শে প্রফেসর বুরহানুদ্দীন রব্বানীকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করা হয়

আহমাদশাহ মাসউদকে। অন্যান্য পদে ইউনুস খালেছ, আবদুর রব্ব, রসূল সাইয়াফসহ প্রমুখ মুজাহিদদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মুজাহিদদের এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ধারণা হচ্ছিল, এই বুঝি আফগান মুসলমানদের কষ্টের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস! নেতাদের ক্ষমতার মোহ জাতির কপালে আবারও দুর্দিন ডেকে আনে। আহমাদশাহ মাসউদ ও বুরহানুদ্দীন রব্বানী হেকমতিয়ারকে মানতে অস্বীকৃতি জানান। হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকা ছেড়ে কাবুল যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে বসেন। সে কারণে রাগান্বিত হয়ে বুরহানুদ্দীন রব্বানীকে সংকটে ফেলেন তিনি। যে কাবুল দীর্ঘ চৌদ্দ বছর রাশিয়ান আগ্রাসনের সময়ও নিরাপদ ছিল, তা গৃহযুদ্ধের কারণে সম্পূর্ণ অনিরাপদ হয়ে পড়ে। কাবুলে জীবনযাপন ধীরে ধীরে দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

গৃহযুদ্ধ ও সরকারের ব্যর্থতা যুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতাদেরকে উগ্র করে তোলে। আইনী বাধা না থাকার কারণে দীনবিরোধী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আফগান ইতিহাসে এমন বর্বরতা ও মুর্খতা সংযোজিত হয় যে, তা দেখে শয়তান ও কুফরী শক্তিগুলোও লজ্জা পেতে থাকে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। মানুষের পেশায় পরিণত হয় চুরি, ডাকাতি। অলঙ্কার ছিনতাইয়ের জন্য আঙুল ও কান কাটার ঘটনাও ঘটতে থাকে। যুবক যুবতীদেরকে দেখে মানুষ সাত পর্দার ভেতরে লুকাতে থাকে। কমিউনিষ্ট শক্তিগুলো মুজাহিদদের নামে ছড়াতে থাকে বিভিন্ন ধরণের অপবাদ। গর্ভবতী মহিলা ও বৃদ্ধারা অপরাধের লক্ষবস্তু হতে থাকে। টেক্সি চালকদের কাছে কিছু না পাওয়া গেলে টেংকি থেকে তেল বের করে নেওয়া হয়।

মোটকথা, মুজাহিদদের নামে শয়তানী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ প্রকৃত মুজাহিদরা ঘরে বসে গিয়েছিলেন। অথবা মশগুল হয়েছিলেন ইলমে দীন শেখা-শেখানোর কাজে। মানুষ এতটাই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুজাহিদ নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা শুরু করতে থাকে। এক পর্যায়ে মানুষ স্বস্তির জন্য জহীর শাহের মত অপদার্থ ব্যক্তিকে স্মরণ করে।

এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা অসহায় আফগানদের উপর রহম করেন। ১৯৯৩ সালে কান্দাহারের 'কশকি নুখূদে' কয়েক জন আলেম একত্র হন। যাদের সংখ্যা রুটির আটায় ব্যবহৃত লবণের চেয়েও কম ছিল। মাত্র ১৮০ জন সদস্য। তাদের মধ্যে পনের/বিশজন আলেম ও মুজাহিদ ছিলেন

নিষ্ঠাবান। আফগানিস্তানের দুর্দশার কথা চিন্তা করে তারা মতাবিনিময় করেন। এস্তেখারা করার পর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। তারা আন্দোলনের নাম দেন 'তাহরীকে তালেবান'।

এক মুখলিস মুজাহিদের জীবন জিহাদের ভাষ্যকার, জিহাদের ময়দানে তাঁর একটি চোখ শহীদ হয়েছে, সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত নিয়ে স্পেনবুলদাকের দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে গতিরোধ করে ভাতা সংগ্রহ করা হচ্ছিল। বেরিকেট সৃষ্টি করা হচ্ছিল। প্রথম বেরিকেটের স্থলেই জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে সম্মুখের সমস্ত বেরিকেট ভেঙ্গে যায় এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থার সফর শুরু হয় কান্দাহারের দিকে।

খুব অল্প সময়ে স্পেনবুলদাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত মুজাহিদদের করতলগত হয়। শরয়ী শাসন কায়েম করা হয় সেখানে। জনগণের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেওয়া হয়। বহিরাগত লোকেরা এক দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয় যে, স্পেনবুলদাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না মুজাহিদদের। কেউ কোথাও ভাতাও চায় না। এটা বিশ্বাসই হতে কষ্ট হচ্ছিল তাদের। অথচ কয়দিন আগেও পথে পথে বিপদের সীমা ছিল না।

একদিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর ও তাঁর সাথীরা পরামর্শ করতে বসেন। সবাই মনোযোগ দেন আল্লাহ তাআলার দিকে। আল্লাহ তাআল মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের অন্তরে একথা ঢেলে দেন যে, কান্দাহার জয় করতেই হবে। এবং একে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী বানিয়ে মানুষের সামনে একটি আদর্শ পেশ করতে হবে। তিনি বললেন, দেরী কিসের? হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাত। দুই পুরস্কারের যেকোন একটি নিশ্চিত। চলুন, শুরু করা যাক।

প্রাথমিক বিজয়গুলো দেখেই দল ভারী হতে শুরু করে। চারদিক থেকে এসে জড়ো হতে থাকে নিষ্ঠাবান মুজাহিদরা। বাইয়াত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। খুবই সাধারণ অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। তালেবানের যাত্রা শুরু হয় কান্দাহার অভিমুখে।

'জালেম সর্বদা ভীত' একথা বাস্তবে প্রমাণিত হয়। সারা দুনিয়ার মানুষ এক আজব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে থাকে। মুমিনদের ছোট দল বিশাল দলের উপর বিজয় লাভ করবে, এই ওয়াদাও পূর্ণ হয়। মুহূর্তের মধ্যে কান্দাহার করতলগত হয় তালেবানের।

তালেবান কান্দাহারে প্রবেশ করেই মুসলিম শাসকদের অনুপম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন আমি তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করব, তখন তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে।[৫]

এসব গুণাবলিই প্রকাশ পেতে থাকে তালেবান থেকে।

সর্বপ্রথম কান্দাহারের জনগণকে তাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ করা হয়। কেননা, তাদের জানমালের নিরাপত্তা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের মনোনীত বাহিনী তালেবানের জিম্মায়। বলা হয়, যদি তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়, তা হলে সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে।

এটাই ছিল হযরত ওমর রা.-এর রীতি। আসমান সাক্ষী, এই ঘোষণার পর জনগণ দলে দলে তালেবানের কাছে অস্ত্র জমা দেয়। এরপর কান্দাহারে আদর্শ নিরাপত্তা উপহার দেয় তালেবান। শরয়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খুনী ও ডাকাতদের শরয়ী শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হয়। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার রহমতের স্বাদ পেতে শুরু করে আফগান জনগণ।

মুসলমানরা লক্ষ্য করে যে, স্পেনবুলদাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত সর্বত্র নিরাপত্তার চাদর বেষ্টিত। জনজীবন আরাম ও তৃপ্তিতে পূর্ণ। কিন্তু অন্যসব অঞ্চলে অনিরাপত্তা ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অথচ উভয় স্থানেই মুজাহিদ বাহিনী তৎপর রয়েছে। তারপরেও পার্থক্য কেন? কেন এই বিশাল?

বিবেক উত্তর দেয়, মুজাহিদে মুজাহিদে পার্থক্য আছে। আছে আসমানে জমীনের তফাত। একদিকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, অন্যদিকে মানব রচিত আইন। একদিকে ইসলামী শূরা ব্যবস্থা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। একদিকে সৃষ্টির আইন, অন্যদিকে স্রষ্টার আইন। একদিকে জিহাদের বরকত, অন্যদিকে কমাণ্ডারদের স্বার্থপূজা। একদিকে ইসলামের বিজয়, অন্যদিকে দলীয়করণ। একদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সেনাবাহিনী, অন্যদিকে স্বার্থপূজারী বিশংখলা সৃষ্টিকারীদের যোদ্ধা। একদিকে কুরআন ও সুন্নাহ,

---

[৫] সুরা হজ: ২২

অন্যদিকে ক্ষমতার নেশা। একদিকের আইনকানুন আল্লাহর অনুগত, অন্যদিকের আইনকানুন শয়তানের অনুগত। একদিকে আল্লাহর গোলামেরা, অন্যদিকে খোদায়ী দাবীদারদের কর্তৃত্ব।

তালেবানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এ কারণে জনসাধারণ দলে দলে তাদের পতাকাতলে এসে সমাবেত হয়। কমাণ্ডারদের ছেড়ে নিষ্ঠাবান মুজাহিদরা হকের পতাকা তলে এসে জড়ো হয়।

কিন্তু শয়তানের অব্যাহত থাকে। প্রচারিত হতে থাকে যে, তালেবানের অধীনে গিয়ে কোন সম্মান পাওয়া যাবে না; কোন পদ মিলবে না। জীবনের আনন্দ শেষ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে বহিঃরাষ্ট্রের সহযোগিতা। না খেয়ে মরতে হবে। কেননা, তালেবানের কাছে কিছুই নেই। বাসী রুটি ছাড়া তাদের কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না।

(মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ'র খেদমতে যে রুটি পরিবেশন করা হয়, তা খেয়ে তার এক সফরসঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেদিকেই ইঙ্গিত করে একথা বলা হতে থাকে।)

অধিকন্তু তালেবানের আনুগত্য মেনে নিলে অস্ত্রও হারাতে হবে।

এ সব বিষয় মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। কিন্তু মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মাওলানা আরসালান রহমানী প্রমুখ নিষ্ঠাবান মুজাহিদ এসবের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাঁরা একজন নেতার অপেক্ষায় থাকেন; আমীরুল মুমিনীনে'র অপেক্ষায় থাকেন। আগের দল ছেড়ে নতুন করে নিষ্ঠাবান মুজাহিদরা তালেবানের সাথে যোগ দেয়। তালেবানরা গরিষ্ঠ হতে থাকে। আসতে থাকে আল্লাহর সাহায্য।

পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামের কাছেও দাওয়াত পৌঁছে। তাঁদের সর্বপ্রথম সাড়া দেন মুফতী নিযামুদ্দীন সামযাঈ। মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা আতাউর রহমান প্রমুখ কান্দাহার অভিমুখে রওয়ানা হন। মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা নাদের কাশ্মিরী, কমাণ্ডার আবদুল জাব্বার হাজার হাজার মুজাহিদ তৈরী করে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের হাতে বাইয়াত করান।

মাওলানা আবদুল গনী, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম মুজাহিদদের খেদমতের জন্য বেলুচিস্তানকে ওয়াক্‌ফ করে দেন। তারা বিভিন্ন মাদরাসা খালি করে দেন মুজাহিদদের জন্য। বহু ছাত্র-উস্তাদ শাহাদাতের নেশায় ময়দানে উপস্থিত নেমে পড়েন।

যতটুকু মনে পড়ে, মাওলানা আবদুল গনী জিহাদ ফ্রজে আইনে হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ চাতরালী শহীদ, মাওলানা আইয়ূব জান বিননূরী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের এলাকাকে তালেবানের হাতে সোপর্দ করেন।

মুফতী রশীদ আহমাদ ঘোষণা দেন যে, তালেবান প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর সৈনিক। সাথে সাথে সহায়তার দরজা খুলে দেন তিনি। নিজের এলাকাকে তালেবানের সহযোগিতার জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। মুফতী রফী উসমানী ও মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানীও বড় আন্তরিকতার সাথে সমর্থনের ঘোষণা দেন। জামিয়া বিন্নুরী টাউন অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে। মুফতী আহমাদুর রহমানের শিষ্যরা থাকেন আগেভাগে। মাওলানা আবদুস সামী' মুহাম্মাদ বিন্নুরী, ড. হাবিবুল্লাহ নিজ ছাত্রদেরকে সাথে নিয়ে কান্দাহার পৌছেন। আশঙ্কাজনক এলাকায় তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ময়দানে নেমে আসেন করাচীর হাকিম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবও। নিজের মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে নিয়ে মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পূর্ব থেকেই সব কাজে আগে আগে থাকত। তাদের কানে যখন ইসলামী বাহিনীর আওয়াজ পৌছে, তখন তারা কালবিলম্ব না করে লাব্বাইক ধ্বনি দিয়ে পাশে দাঁড়ান। ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ তো ছিলেন আফগান মুজাহিদদের নয়নমণি। আর মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন তাঁদের প্রাণের স্পন্দন। তাঁর সহায়তা ও পূর্ণ সমর্থনেই তালেবানরা বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভীর প্রথম ফতোয়ার ভিত্তি করে সারা দুনিয়ার জিহাদী শক্তিগুলো তালিবানদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করে।

মোটকথা, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের হক্কানী উলামায়ে কেরাম ছাত্র ও ভক্তবৃন্দসহ নিয়ে দেহ-মন উজাড় করে এই জিহাদে শরীক হন। এজন্য দুনিয়া দেখতে পায় যে, দেওবন্দী আলেম শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান, শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, ফকীহুন্নফ্স হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতাবী, সাইয়্যেদুত তায়েফা হাজী এমদাদুল্লাহ

মোহাজেরে মক্কী'র মত বুযুর্গদের রূহানী সন্তান তালেবানরা দুনিয়াতে আল্লাহর বাহিনীর কৃতিত্ব আদায় করেছে। লোগার, হেরাত ও গজনীর দিকে তাদের অগ্রযাত্রা বহাল থাকে। খোদায়ী সাহায্যের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। কমাণ্ডার ইসমাঈল ও হিকমতিয়ারের মত বাহাদুর কমাণ্ডারগণও পালানোর পথ দেখতে থাকেন। আবদুল কাদীরের মত বীরও প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন। পক্ষান্তরে মোল্লা ওমরের সমর কৌশল ইসলামী বাহিনীকে কখনও পিষ্ঠ প্রদর্শন শেখায়নি।

একবার অল্প কিছু তালেবান অভিযানে গিয়ে একটি বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হয়। তাদের সংখ্যা ও অস্ত্র-শস্ত্র দেখে সাময়িকভাবে ঘাবড়ে যায় তালেবানরা। প্রথম দিকে কৌশল হিসেবে তারা একটু পেছনে হটতে চাইলে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর বলেন, 'শিকল টানিয়ে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দাও।'

এরপর তিনি নিজে ক্লাজিনকোভ নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। বলতে থাকেন, ময়দান ছেড়ে পালানোর একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাত। তুমুল সংঘর্ষ চলে। এরপর সেই মুহূর্তটি আসে, যখন আল্লাহ মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করে দেন, চোখ ঠান্ডা করেন। অল্পসংখক তালেবান সেই বিশাল বাহিনী দলিত মথিত করে হেরাত নগরীতে এমনভাবে প্রবেশ করে যে, পুরো নগরী তালেবানদের সংবর্ধনার জন্য সাদা পতাকায় ছেয়ে যায়। সবার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল তালেবানদের জয়গান আর অভিসম্পাত করা হচ্ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কমান্ডারদেরকে। গজনীর পথে দুশমনরা এ পরিমাণে বারুদ ভর্তি সুড়ং বানিয়ে রেখেছিল যে, জীবন বিপন্ন না করে সেখানে প্রবেশ করার কোন পথ ছিল না।

সময় পার হচ্ছিল। বিজয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। সামনে বাড়ার কোন পথ নেই। একজন মাদরাসাছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে যায়। চারদিকে নজর বোলানোর পর সে বলে ওঠে, 'আমার সাথে যাওয়ার জন্য কেউ কি প্রস্তুত আছে?

এভাবে আল্লাহর পথে একটি জীবন নযরানা পেশ করা হয়। এক কদম পরিমাণ জায়গা পরিষ্কার হওয়ার পর আরেকটি জীবন চলে যায়। আরেকটু পরিষ্কার হয়। এরপর জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত আল্লাহর সৈনিকদের সামনে থেকে সব বাধা-বিপত্তি সরে যায়। দুশমনদের সব অস্ত্র বিকল হয়ে পড়ে।

দুনিয়া দেখল বীরত্ব আর দুঃসাহসিকতার এক অভিনব দৃশ্য। একের পর এক মুজাহিদগণ নিজেকে রবের হাতে দিতে থাকলেন। ধারাবাহিক পঁচিশ জন মুজাহিদ শাহাদাতের পিয়ালা পান করার পর লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। গজনীতে উড়তে থাকে ইসলামের ঝাণ্ডা। এরপর শুরু হয় কাবুলের পথে অগ্রযাত্রা।

জালালাবাদ বিজয়

একটি পাহাড়ী উপত্যকা, যা চতুর্দিক থেকে ছিল তোপ ও ট্যাঙ্কবেষ্টিত। স্থানে স্থানে ছিল অস্ত্রের স্তুপ। এই দুর্গম উপত্যাটিও একদিন মুজাহিদদের করতলগত হয়।

সমুদ্র তীরে নৌবহর পুড়িয়ে খ্রিষ্টভূমিতে অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার শক্তি যে আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন, তিনিই তালেবানদেরকে দিয়েছেন বিস্ময়কর শক্তি।

তাবলীগের ২য় আমীর হযরতজী ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহকে একবার শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ উপদেশ ছলে বলেছিলেন, 'আরে! মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহ'র মাঝে আর আল্লাহর মাঝে এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি দেদারছে খরচ করতেন। কিন্তু তুমি একটু বুঝেশুনে খরচ কোরও।' তখন হযরতজী ইউসুফ রহ. জওয়াবে বলেছিলেন, 'ভাইজান! নেওয়ার হাতটা না হয় পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু দেওয়ার হাতট তো সেই আগেরটাই রয়েছে।'

মহান আল্লাহ তাআলা বান্দার জযবা ও প্রেরণা দেখেন। দ্বীনের জন্য কুরবানীর আগ্রহ দেখেন। তালেবানদের মাঝে যখন এসব গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সাহায্যের দরজা খুলে দেন। শত্রুরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হেকমতিয়ার ও আহমদশাহরা নিজেদের শক্তি নিয়ে গর্বিত ছিলেন। তারা বলে বেড়াতেন, এবার যদি তালেবান আসে, তা হলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে যুদ্ধ কাকে বলে?

এরপর দুনিয়া দেখতে পায় আল্লাহর ক্ষমতার এক ঝলক। গর্ব আর অহমিকার মাথা এমন কায়দায় নত হয় যে, বড় ধরণের আক্রমণ ছাড়াই শত্রুরা অস্ত্রের গুদাম তালেবানের জন্য রেখে পালিয়ে যায়। আফগান ভূমি থেকে মিটে যায় তাদের নাম নিশানাও। আহমদশাহ মাসউদ হেকমতিয়ারের

মত ক্ষমাশালী নেতাকে বছরে পর বছর কাবুলে ঢুকতে দেননি, কিন্তু সেই মাসউদকে কাবুল থেকে এমনভাবে পালাতে হয় যে, শরীরের নিম্নবসনটুকু সাথে নিয়ে যেতে পারেননি। অল্প কয়জন মাদরাসার ছাত্র তাকে পান্‌জশীর পর্যন্ত ধাওয়া করে।

কমিউনিষ্টদের দালাল কুখ্যাত নজীবুল্লাহকেও ছোট ছোট দু'জন মাদরাসা-ছাত্র হত্যা করে সড়কের মোড়ে ঝুলিয়ে রাখে।

এদিকে ইরান, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, ভারত ও রাশিয়া সবাই তালেবানদের অগ্রযাত্রা দেখে ভয় পেয়ে যায়। তালেবানদের উত্থানকে তারা নিজেদের ক্ষতার জন্য হুমকি মনে করতে থাকে।

হেকমতিয়ার ও আহমদশাহ মাসউদ সুযোগ বুঝে জোট গঠন করেন। তারা এক বাক্যে প্রোপাগাণ্ডা চালাতে শুরু করেন যে, তালেবানরা আমেরিকার দালাল। আফগানিস্তানে তারা আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিপাহী তালেবানরা যখন আফগানজুড়ে পরিপূর্ণ শরীয়ত কায়েম করেন, তখন সব অপপ্রচার হাওয়ায় মিশে যায়। বরং আমেরিকাও তখন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এজন্যই ৮০ শতাংশেরও বেশী এলাকায় তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরও জাতিসংঘ, আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলো তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি অস্বীকার করে। এমন কি পাকিস্তান ও সৌদি আরব বাদে অন্য কোন রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে চাইলেও তারা বাধা সৃষ্টি করে। উসামা বিন লাদেনকে বাহানা বানিয়ে সৌদি আরবকে সমর্থন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়।

এতসব বিপদ জঞ্জা সত্ত্বেও আল্লাহর বাহিনী তাদের লক্ষ্যপানে ছুটে চলতে থাকে বিদ্যুৎগতিতে। ১৯৯৭ 'র মে মাসে এক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কিছু তালেবান সদস্য মাযার-ই শরীফ এলাকায় যান। কিন্তু সেখানকার আঞ্চলিক বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে বন্দি করে। তারপর নিরস্ত্র মুজাহিদদেরকে একত্রে শহীদ করে একটি গর্তে সবাইকে দাফন করে দেয়। দেড় বছরের ব্যবধানে ১৯৯৮ 'র আগষ্ট মাসে মাযার-ই-শরীফে এবং সেপ্টেম্বর মাসে বামিয়ান প্রদেশে তালেবানরা বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। এরপর পরওয়ারন, পান্‌জশীর ও বদখ্‌শান অঞ্চলগুলো জয় করার জন্য এই ইসলামী বাহিনী আমিরুল মুমিনিনীনের নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে। কবি বলেন–

ওরে মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে
ঝঞ্ঝা দেখে শঙ্কা কেন
পশ্চাতে তার বিজয় ভাসে

আফগান আলেমদের উদ্দেশে মোল্লা ওমরের ভাষণ

এক মজলিসে দেড় হাজার আলেমের এক জামাত আমীরুল মুমিনীনকে লক্ষ করে বলেন, বড় আজব কথা, নুরুল ঈযাহ আর কাফিয়া পড়ুয়া ছাত্ররা জিহাদের ময়তদানে শত্রুর মোকাবেলা করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে বড় বড় অনেক আলেম শুধু মৌখিক সমর্থন ব্যক্ত করে যাচ্ছেন?

তখন জবাবে মোল্লা ওমর বলেন–

সময়ের দাবীকে সামনে রেখে ছাত্র, আলেম সবাই ময়দানে নেমে আসা আবশ্যক। উলামায়ে কেরাম মাঠে নামলেই আন্দোলনে গতি আসবে। ছাত্রদের সাহস বাড়বে। দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের ময়দানে দেখে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অনুপ্রেরণা তৈরি হবে। দীন ও ঈমান রক্ষার্থে তারাও নেমে পড়বে জিহাদের ময়দানে। অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের অন্তরেও জিহাদের জযবা উথলে উঠবে। তারা তালেবানদের সহায়তাকারী বিশিষ্ট-সাধারণ, ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য মন খুলে দোয়া করবেন।...

বক্তৃতার শেষে মোল্লা ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তালেবানদের দিক নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তালেবানদের তথ্যমন্ত্রী মোল্লা আমীর খান মুত্তাকী বলেন, শত্রু-মিত্র সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠাই তালবানদের উদ্দেশ্য। শুধু ক্ষমতা বিস্তার তাদের লক্ষ নয়। খ্যাতি তাদের কাম্য নয়। বরং তাদের সিদ্ধান্ত হল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি রক্তের শেষ বিন্দুও ঝরাতে হয় তা হলেও তারা কুণ্ঠাবোধ করবে না।

খাদ্যমন্ত্রী মৌলভী এহসানুল্লাহ এহসান শহীদ বলেন, নযীরবিহীন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, হুদুদ-কিয়াসের বাস্তয়াবন, মামলা-মোকদ্দমায় ইনসাফ কায়েম, জনসাধারণকে নিরস্ত্রকরণ এবং দলীয় বিভক্তি অপনোদন– এগুলো হচ্ছে তালেবানদের কারামত আর ইসলামের অলৌকিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

তিনি আরও বলেন, জনগণ সে সময়ের কথা আজও ভোলেনি, যখন বড় বড় কমাণ্ডারদের তত্ত্বাবধানে নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরত। নারীদের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হত। জুলুম ও বর্বরতার সীমা ছাড়িয়েছিল। বিশেষ-নির্বিশেষ সবাই মেতেছিল অস্ত্রবাজিতে। প্রতিটি মানুষ অতিসাধারণ বিষয়েও অস্ত্র ব্যবহারকে তার নাগরিক অধিকার মনে করত। নিজের দল ছাড়া অন্য দলের কারও নামও শুনতে পারত না তারা। কিন্তু আজ সেসব দলাদলির কোন চিহ্নই বাকি নেই।

সর্বোচ্চ শুরা কমিটির সদস্য মোল্লা মোহাম্মদ হাসান বলেন, তালেবানরাই প্রকৃত ইসলাম কায়েম করেছে। আজ বিশ্বের কুফরী শক্তিগুলো তালেবানদের দুর্নাম রটানোর জন্য ঐকবদ্ধ, সে কথা মুসলমানরা ভালো করেই জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তারা তালেবানের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারবে না।

তালেবানদের প্রতি মোল্লা ওমরের বিশেষ বার্তা

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর জারিকৃত এক নির্দেশনামায় বলেন, পদ-মর্যাদার লোভ থেকে মুক্ত প্রত্যেক মুজাহিদ আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। যেহেতু আমাদের লক্ষ আফগান ভূমিকে ইসলামী শাসনের আদর্শভূমিতে পরিণত করা, তাই রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের কেউ যদি ক্ষমতার অপব্যাবহার করে, তা হলে তার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে পৌঁছে দিবেন। আমি নিজে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

তিনি আরও বলেন, কেউ যেন এমনটা না ভাবে যে, জিহাদের ময়দানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের কারণে, কিংবা বড় কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে জনগণের সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। আমি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারও পরোয়া করব না। তবে হ্যাঁ, আমাদের কাছে কারও ব্যাপারে অভিযোগ পৌঁছানোর আগে অভিযোগকারীকে নিশ্চিত হতে হবে যে, এ ব্যাপারে তিনি কতটুকু সত্যবাদী। ভিত্তিহীন প্রমাণশূন্য অভিযোগ শুনেই আমরা কারও ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেব না। কারণ, একজন মুসলমানের জান-মাল আল্লাহর কাছে যেমন মর্যাদার যোগ্য আমাদের কাছেও তেমনই মর্যাদাপূর্ণ। চাই সে রাষ্ট্রের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হোক বা সাধারণ নাগরিক।

আমেরিকা কতৃর্ক আফগানিস্তানে ক্রুজ মিযাইল হামলার পর ইসলামাবাদ দূতাবাসের মধ্যস্ততায় আমেকিরা মোল্লা ওমরের সাথে আলোচনায় বসতে

আগ্রহ প্রকাশ করে। আমীরুল মুমিনীন তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেন, বিমান হামলার পর আমরা তাদের সাথে আলোচনায় বসব কীভাবে। তারাই তো আলোচনার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমেরিকার কর্তব্য হল, কেনিয়া ও তানজানিয়ার বোমা হামলায় উসামা বিন লাদেনের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করে দেওয়া এবং সুদানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগও প্রমাণ করা। যদি তারা উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয়, তা হলে আমেরিকা ও তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সারা দুনিয়ায় লাঞ্ছনার শিকার হবে। আফগান ও সুদানের কাছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। দুই দেশের জনগণের জান-মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আমীরুল মুমিনীন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, আমেরিকা যদি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে চায়, তা হলে অতি শীঘ্রই যেন উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে তার সৈন্য তুলে নেয়। বিল ক্লিনটনকে এখনই প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। কারণ, তার বিরুদ্ধে অবৈধ যৌনাচারের অভিযোগ আছে। এমনকি এই অপদার্থ আদালতে গর্ব করে এর স্বীকারোক্তিও দিয়েছে।

আফগান ইসলামিক প্রেসের এক সাংবাদিক মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মতে বিল ক্লিনটনের কী শাস্তি হওয়া উচিৎ? তিনি বলেন, ইসলামে তো এই অপকর্মের শাস্তি হল প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। কিন্তু আমেরিকার আইনে এর শাস্তি কী, তা আমার জানা নেই। তবে শাস্তি যাই হোক, একজন প্রেসিডেন্টের এত জঘন্য কাজের স্বীকারোক্তির পরও তাকে এ পদে বহাল রাখা আমেরিকা জন্য চরম লজ্জাস্কর কারণ।

হামলার আগে আমীরুল মুমিনীনের অবস্থান

১. সারা দুনিয়ার সব ক্ষমতাও যদি আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তবুও শায়খ উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে কেউ আমাদের বাধ্য করতে পারবে না।

২. উসামা আমাদের সম্মাণিত মেহমান। কোন লোভ কিংবা চাপের কারণে আমরা তাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারি না। যদি আমেরিকা আমাদের তালেবান রাষ্ট্র মেনেও নেয়, তবুও আমরা তাকে হস্তান্তর করব না।

৩. ধর্মীয় মর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোন মুসলিম কোন কাফেরের হাতে তার মুসলিম ভাইকে তুলে দিতে পারে না।

৪. শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমরা শায়খ উসামাকে হেফাযত করব। প্রয়োজন হলে নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়ে শায়খ উসামার মর্যাদা রক্ষা করব।

৫. আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ আমেরিকাসহ সারা দুনিয়াতে একটি অথর্ব ও অপরাধী সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তারা নিজেদের কুকর্ম ধামা-চাপা দেওয়ার জন্য বোমা বিস্ফোরণের নানান অভিযোগ উসামার উপর চাপাতে থাকে।

৬. উসামা তো মাত্র একজন ব্যক্তি। দূরের একটি দেশে এত প্রচণ্ড হালমা করার উপকরণ তিনি কোথায় পাবেন?

ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করলে সাহাবায়ে কেরামের যেসব কারামতপূর্ণ ঘটনা পাওয়া যায়, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব তালেবান মুজাহিদদের জীবনকেও সেসব ঘটনার মালা দিয়ে সাজিয়েছে। প্রত্যেক মুজাহিদকে তিনি গড়ে তুলেছেন একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে। আমীরের আনুগত্যের সামনে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করতেও কোন মুজাহিদ দ্বিধা করেন না।

ইতিহাস সাক্ষী, আফগান যুদ্ধের আগ থেকেই পাখতুনদের মেহমানদারীর প্রথা জনসমাজে প্রবাদ হিসেবে পরিচিত। এ গুণটি আমীরুল মুমিনীনের সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য। আরব মেহমান উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে শুধু কথা নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কথা। যখন আমেরিকা ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের কাছে উসামা বিন লাদেনকে তার তুলে দেওয়ার দাবী করল, তখন পর্বতসিংহ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর এমন এক ঈমান উদ্দীপক ভাষণ দিলেন, যা একমাত্র তৃতীয় ওমরের মুখেই শোভা পায়। আফগান জাতিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন–

হে আফগানিস্তানের মুসলিম জাতি! তোমরা বলো, আমরা যদি হারামাইন শরীফাইনের মেহমান শায়খ উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিই, তা হলে কি আফগান ভূমি আর সাধারণ জনগণ আমেরিকার নিগ্রহ থেকে রক্ষা পাবে? অসহায় নারী-শিশুকে লক্ষ্য করে আমেরিকার বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ কি বন্ধ হবে? শায়খ উসামাকে বাহানা বানিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী দর্শন মোতাবেক গড়ে ওঠা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের পতন ঘটানোই কি তাদের দূরভিসন্ধি নয়? যদি শায়খ উসামাকে আমরা তাদের

হাতে তুলে দিই, তা হলে কোথায় থাকল পাখতুন জাতির মেহমানদারীর ঐতিহ্য? কোথায় থাকল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদর্শ? যদি এমন ভুল পদক্ষেপ আমরা নিয়েই ফেলি, তা হলে যতদিন এ দুনিয়া থাকবে, ততদিন এই অপকীর্তি আফগান জাতির কপালে একটি কলংক তিলক হয়ে থাকবে। আর (মেহমানকে শত্রুর হাতে তুলে না দেওয়ার) পূর্ব পুরুষদের মহান ঐতিহ্য বিনাশকারী হওয়ার কারণে ইতিহাস আমাদেরকে কখনও ক্ষমা করবে না। আবার বলছি, শুধু শায়খ উসামাকে হস্তান্তর করলেই কি বন্ধ হয়ে যাবে আমেরিকার হিংস্রতা? নিরাপদ হয়ে যাবে আমাদের মা-বোনের জীবন? শান্তি ফিরে পাবে এদেশের জনগণ?

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ আফগান যুদ্ধের পূর্বে ও পরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একজন আদর্শ মহামানব রূপে। তিনি খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে ধন্য করেছেন ইসলামী বিশ্বের সবাইকে। আলখেল্লা আর ঘন দাড়ি বিশিষ্ট এই ব্যক্তিকে তৃতীয় ওমর বলা কখনই অতিরঞ্জন নয়। কেননা, তার জিহাদী জযবা আর অপ্রতিরোধ্য উদ্যমের বদৌলতেই এ অন্ধকার পৃথিবী আরেকবার আলোকিত হয়। ঝিমিয়ে পড়া ইতিহাসে আরেকবার ফিরে আসে ইসলামী বিপ্লব। যতদিন দুনিয়ার আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, আফগান জাতি ও সমগ্র বিশ্ব এই মহান দরবেশ নেতাকে স্মরণ করবে। একজন বীর শাসক আর দুঃসাহসী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। কারণ, তাঁর শাসনামলেই এ পৃথিবী বহু দিন পর ইসলামী শাসনের বাস্তবায়ন দেখতে পায়। দুনিয়ার মানুষকে বিস্মৃত খেলাফতে রাশেদার সবক তিনিই স্মরণ করিয়েছেন।

মোল্লা ওমরের নেতৃত্ব জিহাদী বীরদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। মুজাহিদদেরকে জিহাদের পূর্ণ ফলাফল বুঝে পাওয়ার বিরল সুযোগ তৈরি করে দেন তিনি। তার শাসনামল বীরত্ব আর সাহসিকতার এমন সব কীর্তি দিয়ে পরিপূর্ণ, যেগুলোর কথা শুনে দুনিয়া হতভম্ব না হয়ে পারে না।

কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র ফরয আজ পশ্চিমা বিশ্বের প্রোপাগাণ্ডার কারণে সীমাহীন জুলুমের শিকার। আফগানরা নতুন করে সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের নযীর স্থাপন করে। এবং কুফরী বিশ্বকে নাকানী-চুবানী খাইয়ে ছাড়ে। এতদিন কাফেররা মুজাহিদদের যে অনুপম আদর্শের কথা শুধু ইতিহাসের পাতায় পড়ে আসছিল, আজ আফগান জাতি তার বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দেয়। এমন কি অন্য মুসলিমরাও এই মর্দে মুজাহিদকে দেখে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক আর আদর্শ মুসলিম নেতা কেমন হতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ উপলব্ধি করে।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর আমেরিকার অবৈধ প্রস্তাবে এমন সমুচিত ও অনমনীয় পন্থা অবলম্বন করেন, যার প্রভাব আফগান জাতির মনমগজ আচ্ছন্ন করে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ আরও কয়েক মাত্রা বেড়ে যায়। আফগান জাতিকে লক্ষ্য করে আমীরুল মুমিনীন বলেন, ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভ আমার বিন্দুমাত্রও নেই।

আমি ছেড়ে দিলে যদি ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান'র আকার-আকৃতি আপন আদর্শে বহাল থাকে, তা হলে এই মুহূর্তেই আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী আছি। আমি তো নিজেকে মুসলমানদের একজন সেবকই মনে করি। কিন্তু আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করছি না, কারণ শায়খ উসামাকে ঘিরে আমেরিকার আসলে কোন গরজ নেই; বরং দেশটির আসল মনোবাঞ্ছা হল আফগানভূমি থেকে জিহাদ ও কুরআনের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়া। তা আমি কখনও মেনে নিতে পারব না। তাদের প্রকৃত শত্রুতা শায়খ উসামার সাথে নয়; বরং এই ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে, যা তালেবান মুজাহিদরা নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের এই পূণ্য ভূমি টিকিয়ে রাখতে তালেবানরা যে কোন মূল্য খরচ করতে রাজী।

যদি আমার সন্তান শহীদ হয়ে যায়; যদি আমার বংশের একটি সন্তানও জীবিত না থাকে এবং আমি নিজেও যদি শহীদ হয়ে যাই, তবুও এই জিহাদী তৎপরতা টিকিয়ে রাখব। যদি আফগানিস্তানের প্রতিটি দেয়াল ভেঙে টুকরো টুকরো করো হয়, তবুও আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উপর যে কোন মূল্যে আমল করে যাব। জীবনের একটি নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত আমাদের ভাই শায়খ উসামাকে কখনও দুশমনের হাতে তুলে দিব না।

হে আফগান মুসলিমরা! তৈরী হয়ে যাও এমন সব কুরবানীর জন্য, যেগুলো ইসলাম আমাদের কাছে কামনা করে। এখনই আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ দেওয়ার সময়। বীরত্বের ঐহিত্য ফিরিয়ে আনার সময়। এবং ইসলামের জন্য হাসি মুখে জীবন বিলানোর সময়। আসুন, আমরা সবাই অঙ্গীকার করি যে, শত্রুকে আফগানভূমিতে পা জমাতে দিব না। জীবনের

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদ করে যাব। হয়তো এই ভূমিতে শত্রুর দাফন হবে, নয়তো আমরা সবাই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব। যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই হিংস্র অত্যাচারী সামরাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারি।

আমেরিকার আক্রমণের পর

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ বলেন–

১. আক্রমণ উসামাকে লক্ষ্য করে নয়, ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র ও আফগান জনগণকে লক্ষ্য করে।

২. আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমেরিকা আফ্রিকার বোমা হামলায় উসামাকে দোষী করার কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না।

৩. উসামা বিন লাদেনকে আমরা আগেই অন্যকোথাও স্থানান্তর করে ফেলেছি। এ আক্রমণ একেবারে অর্থহীন। এতে বেসামরিক ও নিরপরাধ লোকদেরই ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

৪. যদি সম্পূর্ণ আফগানভূমিও উল্টে যায়, যদি আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাই, তবুও উসামাকে তাদের কাছে হস্তান্তর করব না। একজন মুসলিমকে কোন কাফেরের হাতে তুলে দেওয়া আমার আত্মমর্যাদা কখনও সহ্য করবে না।

৫. আমরা আফগান জাতি। ইসলামী মর্যাদাবোধে টইটুম্বুর আমাদের। আমরা সব ধরণের শঙ্কা মাথায় বহন করতে প্রস্তুত।

৬. উপর্যুপরি আক্রমণের ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে আমীরুল মুমিনীন বলেন, আমেরিকার যা করার ইচ্ছে করুক, আমরাও যা করতে পারি তা করে দেখাব।

দৈনিক আন্‌নাহার পত্রিকায় আমীরুল মুমিনীনের সাক্ষাৎকার

লেবানরের আরবী পত্রিকা দৈনিক আন্‌নাহারে প্রদত্ত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের একটি সাক্ষাৎকার এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

আন্‌নাহার : আপনি কি আমাদেরকে তালেবান আন্দোলনের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলবেন? কিভাবে এবং কার হাতে এর সূচনা হয়? এ পর্যন্ত কী কী পর্যায় অতিক্রম করেছে? এর সিদ্ধান্ত কীভাবে কার্যকর করা হয়? আপনি তালেবানদের শুরা বোর্ডের সদস্য ও দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে কিছু বলবেন?

সাথে সাথে এও বলবেন কি, আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

আমীরুল মুমিনীন : ইসলামী আন্দোলন তালেবান আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে রাশিয়ার পরাজয়ের পরবর্তী কালে নামসর্বস্ব মুজাহিদদের শাসনামলের পর অস্তিত্বলাভ করেছে। দলটি নেককার, দ্বীনাদার ও ছাত্র মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত। এ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল উলামায়ে কেরামের একটি ফতোয়ার উপর। ১৫-১-১৪১৫ হিজরী সনে কান্দাহারের মেওয়ান্ত জেলা থেকে আমার তত্ত্বাবধানে এর সূচনা হয়। মহান আল্লাহর তাআলার সাহায্য ও আফগান জাতির সার্বিক সহায়তা নিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। শুরুতে আমরা দায়িত্বশীল সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করি। যাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে পুরো আফগানিস্তান অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়েছিল। অস্ত্র জমা দিয়ে তাদেরকে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে বলি। তাদের মাঝে যারা তা মানতে অস্বীকার করে, আমরা বলপ্রয়োগ করে তাদেরকে নিরস্ত্র করি। আন্দোলনের সকল কার্যক্রম ও সর্বোচ্চ শুরাবোর্ডের সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার একমাত্র আমীরের অধীনে। শুরার সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। অধিকাংশ সদস্য ছিলেন অতিরিক্ত ফোর্স ও সাংগঠনিক ও অন্যান্য পদের দায়িত্বশীল। সূচনার কিছু দিন পর প্রায় দেড় হাজারের মত আলেম সম্মিলিতভাবে আমার হাতে শরঈ বাইয়াত নিয়ে আমি অধমকে আমীরুল মুমিনীন বলে ঘোষণা দেন। এরই মধ্য দিয়ে তালেবানরা আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে ইমরাতে শরঈয়্যাহর অবস্থানে পদার্পণ করে। এরপর অন্য সব দলের পরিসমাপ্তি ঘটে। পুরো আফগান জাতি আমীরুল মুমিনীনের হাতে ইসলামের মূলনীতির আলোকে বাইয়াত গ্রহণ করে। বিশেষ-নির্বিশেষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই একবাক্যে আমীরুল মুমিনীনকে মেনে নেয়।

আন্‌নাহার : ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে তালেবানদের অবস্থান কী? তারা কি শুধু হানাফী মাযহাবেই সীমাবদ্ধ, না কি অন্যান্য মাযহাবেরও অবকাশ আছে? তালেবানদের রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন কি শুধু হানাফী মাযহাব মতেই পরিচালিত হয়, না কি অন্যান্য মাযহাবকেও সামনে রাখা হয়?

আমীরুল মুমিনীন : তালেবানদের অধিকাংশই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। এখানে ফিকহে হানাফীর উপরই আমল হয়। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও ফিকহে হানাফীর আলোকে বানানো হয়েছে। এটা

আফগানিস্তানের সবশ্রেণীর মানুষের চিন্তাগত ঐক্যের জন্য একটি নেওয়ামতই বলতে হবে। ইনশা আল্লাহ, ভবিষ্যতেও এ নিয়ম বলবৎ থাকবে।

আন্‌নাহার : তালেবানরা কি শুধু ওইসব কিতাবই ফলো করে, যেগুলো ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্ররা লিখে গেছেন? না কি আইন-কানুন সাজানোর ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের উলামায়ে কেরামের কিতাব থেকেও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে।

আমীরুল মুমিনীন : সৌদি আরব ও হিন্দুস্তানসহ বিভিন্ন দেশের অন্যান্য মাযহাবের আলেমদের কিতাবাদি থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়।

আন্‌নাহার : সূচনা থেকেই ইসলামী আন্দোলন তালিবান মুসলিম বিশ্বের জন্য আদ্যোপান্ত একটি গোপন রহস্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তালেবানদের ব্যাপারে সবসময়ই মুসলিমরা অজ্ঞতার শিকার। আপনার ধারণায় এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, ইমারাতে ইসলামিয়্যার পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে। তারা মুসলিম বিশ্বের সামনে তালেবনাদের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম তুলে ধরবে?

আমীরুল মুমিনীন : তালেবানদের কীর্তি আফগান জনগণের কাছে কখনই গোপন ছিল না। তবে মুসলিম বিশ্বে তালেবানদের বিষয়টি অজ্ঞাত রয়েছে, কারণ, অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীলরা আফগানিস্তানে খুব কমই আসেন। পশ্চিমা বিশ্বের যে সব নেতৃবর্গ ও সাংবাদিকরা এখানে আসেন, তারা আমাদের অধিকাংশ কার্যক্রম ও আইন-কানুন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন। তাদের বিবৃতিগুলো পক্ষপাতদুষ্ট। কুচিন্তায় ভরপুর। তবে হ্যাঁ, এ পর্যন্ত ইমরাতে ইসলামিয়্যাহ আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। ইনশা আল্লাহ অতিসত্বর অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে।

আন্‌নাহার : বর্তমানে তালেবানরা আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকায় তাদের শাসনকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় শক্তি আগের চেয়ে কিছুটা কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যদি একটি মজবুত কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সুযোগ আপনার এসে যায়, তা হলে কি এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব আপনাকে এটা করতে দিবে? এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি?

আমীরুল মুমিনীন : আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ইসলামী ইমারতের কেন্দ্রীয় সরকার আগের চেয়ে অনেক মজবুত। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা মজবুত ও ক্ষমতাশীল, তা অভ্যন্তরীণ সচলাবস্থার উপরই নির্ভর করে। বহির্বিশ্বের বিরোধিতা, প্রোপাগান্ডা এখানে অর্থহীন। একদিন ঠিকই তারা তালেবানদের বাস্তবতা জানতে পারবে। তখন অবৈধ সমালোচনা থেকে ফিরে আসতে তারা বাধ্য হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আন্‌নাহার : আমিরুল মুমিনীন, আপনি ভালো করেই জানেন যে, প্রতিটি নতুন সরকারের নিজস্ব কিছু সাফল্য থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ইত্যাদির মধ্য থেকে আপনারা কোন্ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন? কোন সরকারের সাফল্যের জন্য শুধু শরীয়ত কায়েম করতে পারাই যথেষ্ট নয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তার কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ, কৃষিকাজে আধুনিক সরঞ্জামাদির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনি ইসলামী আইনের আলোকে কীভাবে সমাধান করবেন? রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আপনার আগাম কোন পরিকল্পনা আছে কি? নাকি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আপনি বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছেন?

আমিরুল মুমিনীন : এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, ইসলামী শরীয়ত মানবজীবনের সমস্ত শাখার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সবিস্তারে বয়ান করেনি; বরং কিছু মূলনীতির আলোকে অভাবনীয় সমাধান দিয়েছে। শরীয়তের সেই মূলনীতিগুলো মানবজীবনের কাজসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করে। কিছু কাজ আছে এমন, যেগুলো অবস্থা-প্রকৃতি, সময়সীমা সবকিছু স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। আর কিছু কাজ আছে এমন, যেগুলো আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের উপর করে সমাধান করার জন্য মানুষের কাঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের দায়িত্ব হল পরিস্থিতি-পরিবেশ স্থান-কাল বিচার করে সেসব বিষয় নিজেদের মত করে সমাধান করবে। ইসলামী শরীয়ত যাতে কোন বিশেষ সমাজ, নির্দিষ্ট কাল বা পরিবেশের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে, সে জন্যই এই ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামের নীতিমালা ও আইন-কানুনের সাথে আধুনিকতার কোন সংঘর্ষ নেই। যুগোপযোগী কাজ ও উন্নতি করার দায়িত্ব মানুষের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। তালেবান সরকার এক্ষেত্রে কোন জটিলতার সম্মুখীন হয়নি। আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কয়েকটি প্রকল্প

হাতে নিয়েছি। আফগান সমাজে নারীদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের বিষয়টি ধর্মীয় শ্লীলতা ও আফগান জাতির ঐতিহ্য সামনে রেখেই সমাধা করা হবে। সব ক্ষেত্রে এখানে এমন কর্মপন্থাই অবলম্বন করা হবে, যা একটি জাতির সমাজিক জীবনে উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। এবং সমস্ত নাগরিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নিশ্চিত করে।

আন্‌নাহার : তালেবানের উচ্চপদস্থ কর্মকতা কতজন? তারা সবাই কি সামরিক দায়িত্ব পালন করেছেন?

আমিরুল মুমিনীন : যখন একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক তথা কাজের উপযুক্ত হয়, তখন থেকেই সে তালেবানের সদস্য হতে পারে। বর্তমানে বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমাদের কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে ইখলাস ও নিষ্ঠা, দ্বীনদারী ও খোদাভীতি আর উদ্দিষ্ঠ কাজের দক্ষতা। অধিকন্তু কাজের ধরণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, সহজ ও জটিল কাজ, আমানতদারীর কাজ, দক্ষতাসম্পন্ন কাজ। তবে সামরিক বাহিনীতে ভর্তির জন্য আমাদের অবশ্য কিছু নীতিমালা আছে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষা থাকাও আবশ্যক করা হয়েছে। সর্বোপরি সমাজের বহুমুখী কল্যাণ সাধন ও উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে অনেক ধরণের পদক্ষেপই গ্রহণ করা হবে।

আননাহার : হঠাৎ করে সৌদি আরবের সাথে আপনার সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে গেল, এর কারণ কি? উসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তানে উপস্থিতি, না কি সৌদি সরকার ইরানের সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে তাদের সুদৃষ্টি অর্জন করতে চাচ্ছে।

আমিরুল মুমিনীন : এ বিষয়ে যা কিছু হয়েছে, তা সৌদি সরকারের পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এই প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব তারাই ভালো জানবে। উসামা বিন লাদেনের উপস্থিতি ছাড়া আমাদের অন্যকোন কারণ জানা নেই। উসামা বিন লাদেন তো ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই আফগানিস্তানের মেহমান হিসেবে আছেন। তিনি অঙ্গীকার করেছেন, সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। এ অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই তাকে এখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আননাহার : একদিকে আফগানিস্তানে আমেরিকা মিজাইল বর্ষণ করছে; অপর দিকে আমেরিকা ও পশ্চিমা কয়েকটি দেশের কিছু কোম্পানি তালেবানদের সাথে ব্যবসায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইছে। এমতাবস্থায়

ইসলামী ইমারত কোন দেশের কোম্পানীকে প্রাধান্য দিবে– আমেরিকার, ফ্রান্সের, জাপানের না চীনের?

আমিরুল মুমিনীন : আন্তর্জাতিক সমস্ত নীতিমালা লঙ্ঘন করে আমেরিকা আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। উপর্যপুরি মিজাইল বর্ষণ করে নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্য করছে। সমগ্র বিশ্ব এসব হিংস্র ও পাশবিক আচরণ দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণই এর নিন্দা জানিয়েছে। বর্তমানে আফগানিস্তানে যেসব প্রতিষ্ঠান ও ভিনদেশী কোম্পানী কাজ করে যাচ্ছে আমেরিকার সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তারা নিজ নিজ কারবার নিয়েই ব্যাস্ত।

আননাহার : আপনাদের চিন্তা-ভাবনায় বর্তমানে অর্থনৈতিক কোন পদক্ষেপ আছে কি? এর জন্য দক্ষ কোন অর্থনীতিবিদের পরামর্শ নিয়েছেন?

আমিরুল মুমিনীন : কয়েকটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ আমাদের পরিকল্পনাধীন আছে। পূর্ণ নিরাপত্তা ফিরে এলেই সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। আফগানিস্তানের দক্ষ অর্থনীতিবিদরাই এর সমাধান করবেন। তবে বিদেশি ব্যক্তিবর্গ যদি এগিয়ে আসতে চান, তা হলে আমরা তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করব।

আননাহার : আফগানিস্তানে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলে আপনারা কি করাচীর সমুদ্রবন্দরকে নিজেদের প্রধান বন্দর হিসেবে ব্যবহার করবেন? আপনারা পাকিস্তানের সাথে কোন ধরণের অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন?

আমিরুল মুমিনীন : পাকিস্তানের সাথে আমাদের ট্রানজিট চুক্তি ছিল। কিন্তু নৌবন্দর ব্যবহারের বিষয়ে পাকিস্তান এখনও কোন সিদ্ধান্ত জানায়নি। আমরা বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সকল পথই খোলা রাখতে চাই।

আননাহার : রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আপনি আমাদের কিছু বলবেন কি? আপনি কি এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যার ফলে রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের পূর্ব সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে?

আমিরুল মুমিনীন : রাশিয়া এখনও আফগানিস্তানের সাথে সেই শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছে, যা তারা অতীতেও পোষণ করত। এই ভিত্তিতেই তারা আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

অঙ্গনে এতই ভয়াবহ ক্ষতি ধাসন করেছে যে, আফগান জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, জিহাদের পথে রাশিয়া শুধু পরাজিতই হয়নি; বরং তারাও বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয় মাথায় নিয়ে এদেশ পরিত্যাগ করেছে। বর্তমানে রাশিয়া নিজের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতেই হিমশিম খাচ্ছে।

আননাহার : সমপর্যায়ের রাষ্ট্র হওয়ার কারণে ইরানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আপনার মনোভাব কী? ইরানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার ব্যাপারে কোন্ বিষয়টি আপনার কাছে আবশ্যক বলে মনে হয়?

আমিরুল মুমিনীন: আমরা সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক রাখতে জোর দিচ্ছি। তবে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও এক্ষেত্রে ব্যাপক দখল রয়েছে। ইরানের সাথে সকল সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হল তাদের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন।

আন্‌নাহার : বলা হয়, আফগানিস্তানে নেশাজাতীয় পণ্য উৎপাদন করা হয় এবং অন্য দেশে রপ্তানী করা হয়। কোন্ কোন্ এলাকায় এসব চাষ হয়? মোট জমির পরিমাণ কত? কোন ধরণের নেশাকর ফসল চাষ করা হয়? ইসলাম ধর্মে সেগুলোর বৈধতা আছে কি? এখানে পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তা কী পরিমাণ?

আমিরুল মুমিনীন : আফগানিস্তানে নেশাজাতীয় ফসলের চাষ হয় দীর্ঘ কাল থেকে। এই উৎপাদন বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বড় কোন সহায়তাও পাওয়া যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে, যদি ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানকে জাতিসংঘ মেনে নেয়, তা হলে চাষীদেরকে মাদক চাষ বন্ধ করার বিনিময় দেওয়া হবে। আমরা সর্বোতভাবে মাদক চাষ বন্ধ করতে আগ্রহী। কিন্তু বিশ্বের কোন দেশই এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। মাদকচাষের জমির কত, তার সঠিক হিসাব রয়েছে ইউএনভিসিপি'র কাছে। আমাদের কাছে এখনও নিশ্চিত হিসাব পৌঁছেনি। ইসলাম ধর্মে কোন নেষাজাতীয় পণ্যের চাষ শুধু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য বৈধ। কিন্তু যদি একে নেশা করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা হলে ইসলাম কখনও এর অনুমতি দেয় না।

আন্‌নাহার : ইরান আর আফগানিস্তান উভয় দেশের পক্ষ থেকে হুমকি আদান-প্রদান চলছে। কিন্তু ইরান কি আজ পর্যন্ত আগে বেড়ে কোন প্রস্তাব পেশ করেছে? কিংবা আপনারা কি সৌদি আরব কিংবা পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরানের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন?

আমিরুল মুমিনীন : ইরানের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোন প্রস্তাব আসেনি। আমরা দূতমারফত আমাদের প্রস্তাবগুলো ইরানের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এবং তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা করার আগ্রহও প্রকাশ করেছি।

আন্‌নাহার : সৌদি আরবের সাথে আপনাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। আপনার কি আশঙ্কা হচ্ছে না যে, পাকিস্তানও আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে দিতে পারে। ইসলামাবাদের সাথে আপনার বর্তমান সম্পর্কের উপর আস্থা রাখতে পারেন কি?

আমিরুল মুমিনীন : সৌদি আরবের সাথে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়নি। এখনও উভয় দেশের দূতাবাস নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্য হয়েছে উপরস্থ কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের সাথে আমাদের বিস্তর জায়গা জুড়ে সীমান্ত সম্পর্ক। উভয় রাষ্ট্রের সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠানও প্রায় এক ধরণের। তাই আমাদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কোন কারণ দেখছি না।

আন্‌নাহার : উসামা বিন লাদেনের কারণে সৌদি আরবের সাথে যে রাজনৈতিক টানপড়েন সৃষ্টি হয়েছে, আপনার মতে তার সমাধান কী? তার কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার জন্য কি আপনার নিশ্চয়তা প্রদানই যথেষ্ট। না কি আপনি তাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে সোপর্দ করবেন? যদি তা করেন, তা হলে কোন্ রাষ্ট্রের কাছে করবেন? আপনি কি মনে করেন উসামা সৌদি আরবের জন্য বিশেষ কোন গুরুত্ব রাখে? যদি না হয়, তা হলে তাকে নিয়ে সৌদির এত মাথাব্যাথা কেন?

আমিরুল মুমিনীন : উসামাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে সোপর্দ করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। শায়খ উসামা সৌদি আরবের জন্য বিশেষ কোন গুরুত্ব রাখেন কি না সে প্রশ্নের উত্তর আপনারা সরাসরি তার থেকেই জেনে নিন। আমরা শায়খ উসামা থেকে লিখিত অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তিনি সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। শায়খ উসামাকে নিয়ে

সৌদি আরবের সাথে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে আমরা প্রস্তাব পেশ করেছি যে, সৌদি আরব ও আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম একত্রে বসে কুরআন-হাদীস মোতাবেক এর সমাধান বের করবেন। সৌদি আরবকে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের আলেম প্রতিনিধিদল তৈরী করে।

আন্‌নাহার : জাতিসংঘের বিশেষ দূত আলআখদার ইব্রাহিমী আফগানিস্তান ও ইরানে কয়েকবার সফর করেছেন। আপনি কি তার সফর থেকে কোন আশা পোষণ করছেন?

আমিরুল মুমিনীন : ইব্রাহীমী তো সালিসীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তবে তার চেষ্টার সফলতা উভয় পক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। আমরা আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। এখন আমাদের আশা ভরসা দ্বিতীয় পক্ষের সহায়তার উপর নির্ভর করছে।

আন্‌নাহার : আমার সর্বশেষ প্রশ্ন ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে পাখতুন জাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে সম্পর্ক কেমন হবে? অধিকন্তু হানাফী মতাদর্শের লোক ও অন্যদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে আপনাদের ধারণা কেমন?

আমিরুল মুমিনীন : আফগানিস্তানের পুরো ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন বংশের লোকেরা পরস্পর মিলে-মিশেই এখানে বসবাস করছে। আজও তারা বিচ্ছিন্নতা পছন্দ করে না। কিছু যুদ্ধবাজ সংগঠন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদের মাঝে প্রতিহিংসার ইন্ধন যোগানোর চেষ্টা করছে। জনসাধারণ তাদের অপকৌশলে প্রভাবিত হয়নি। আমাদের এখানে কোন ফিরকাবাজীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান'র সরকারী দায়িত্বশীলদের প্রতি আমিরুল মুমিনীনের বার্তা

তালেবানদের কেন্দ্র কান্দাহার থেকে প্রকাশিত এক বিশেষ বার্তায় আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ (আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহিল আকবার) ইসলামী ইমারতের সাথে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রী, গভর্নর, কমাণ্ডার ও মুজাহিদদের উদ্দেশ করে বলেন, তারা যেন সৎ কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেন। অধীনস্তদেরকে নেক কাজের প্রতি আহ্বান করে তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনারা নিজেদের ও অধীনস্তদের

আমল পরিশুদ্ধ করার প্রতি দৃষ্টি দিন। অন্যথায় ভবিষ্যতে আপনাদের আক্ষেপ করতে হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তিও যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করে ফেলে, তা হলে তার ব্যাপারেও নীরবতা পালন করা যাবে না। আমরা রাশিয়া কিংবা আমেরিকার বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইনি; বরং আমাদের প্রধান শত্রু ছিল ওইসব শাসক, যারা অপকর্মের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে আবাবিল সদৃশ এমন পাঁচজন মাদরাসাছাত্রকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। সুতরাং আমরাও যদি আজ তাদের মত অপকর্মে লিপ্ত হই, তা হলে আমাদেরকে পরিণতি পূর্ববর্তীদের চেয়েও শোচনীয় হবে। তাদের চেয়েও বড় বেশি লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আমীরুল মুমিনীন বলেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় মুসলমানদের জন্য মূল বিষয় নয়; বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রতিটি কদমে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা।

তিনি বড় দরদমাখা কণ্ঠে বলেন, দীনের জন্য সারা দুনিয়ার দুশমনী মাথা পেতে নিয়েও যদি আমরা দীন মেনে না চলি, তা হলে স্মরণ রাখতে হবে, কোন শক্তিই আমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

দৈনিক 'শরীয়ত'কে প্রদত্ত আমীরুল মুমিনীনের সাক্ষাৎকার

হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ তালেবান আন্দোলনের মুখপাত্র, পশতু দৈনিক পত্রিকা 'শরীয়ত'কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ইসলামী ইমারত সব মুসলিম ও অমুসলিম দেশ বিশেষত পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে প্রত্যাশী। আমরা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চাই না। অন্যান্য দেশের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, তারাও যেন আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করে দেয়। এবং আমাদের শত্রুদের সহযোগিতা থেকে ফিরে আসে। আফগানদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দিতে হবে। যদি কোন দেশ অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে ফিরে না আসে, তা হলে আমরা তাদের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারব না, তাদের মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আজ ৯০ শতাংশ আফগান অঞ্চল ইসলামী ইমারতের অধীনে চলে এসেছে। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে। কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের জান-মাল, সম্ভ্রমের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। দেশের লোকজনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে। সব ধরণের জোর-জুলুম ও চরম পন্থার অবসান হচ্ছে। স্বশস্ত্র শক্তিগুলোকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে। যখন এসব কিছু হয়েছে ও হচ্ছে, তখন দুনিয়াবাসীর উচিত ছিল স্বার্থ উদ্ধার ছেড়ে দিয়ে আফগান জাতির মনোভাব মূল্যায়ন করা। উত্তরাঞ্চলীয় কিছু জোট যারা মাত্র পাঁচ শতাংশ অঞ্চলে উপর নামে মাত্র ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে, যেখানে জনসাধারণের জীবন সম্পদ কিছুই নিরাপদ নয় এবং সেখানকার সশস্ত্র বাহিনীগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত, জাতিসংঘ ওই বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোকে সমর্থন দিয়ে আফগান জাতির সাথে আরেকটি বড় অবিচার করেছে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে আমীরুল মুমিনীন বলেন, ওইসব সংগঠন ও মুজাহিদবর্গ, যারা দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে, পরবর্তীতে জিহাদের লক্ষ ও ফলাফল সংরক্ষণ করার চেষ্টাও করেছে এবং আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনৈসলামিক কোন যুদ্ধে জড়ায়নি, ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান তাদেরকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করবে। যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুপাতে তাদেরকে সরকারী বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এমনইভাবে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে ওইসব নিষ্ঠাবান আফগানদেরকে আমাদের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার, যারা ইসলাম ও রাষ্ট্রকে ভালোবাসে এবং নতুন সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টায় অংশ নিতে আগ্রহী।

নারী অধিকার, তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে মোল্লা ওমর বলেন, নারী অধিকার বলতে আমরা তাই বুঝি, যা ইসলাম তাকে দিয়েছে।

রাষ্ট্রে একাধিক সংগঠনের উপস্থিতির ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী বিপ্লব সফলতার সদর দরজায় পৌঁছনোর পরও একাধিক সংগঠন ও দলগত বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণেই আমাদের পুরো দেশটি গৃহযুদ্ধের আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে। জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে; চৌদ্দ বছরের দীর্ঘ কুরবানী

সব পানিতে ভেসে গেছে। এজন্য আমরা কখনও চাই না যে, আফগান জাতি আরেক বার সেই ধ্বংসাত্মক বিভক্তির শিকার হোক। কেননা, ধ্বংস ও বরবাদীর মূল কারণ এ-ই। আমরা অতীতের তিক্ত বাস্তবতার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাই না। ইসলামেও দলগত বিভক্তি একটি বড় নিন্দনীয় বিষয়।

রাজনৈতিক পর্যালোচনা ও গোলটেবিল বৈঠকের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন বলেন, সন্ধি, সমাধান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্যই তালেবান আন্দোলন অস্তিত্ব লাভ করেছে। আমরা সবসময় বিরোধী পক্ষের সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে সংলাপ ও সমঝোতার পথ অবলম্বন করেছি। কিন্তু দূর্ভাগ্য যে, বিরোধী পক্ষ যুদ্ধের মাঝেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখে। তাই সবসময় তারা সমঝোতার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও এখনও আমরা বিরোধীদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে রাজী আছি। এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, ফলাফল তারাই নির্ধারণ করবে; তবে তা হতে হবে ইসলাম ও জাতির জন্য কল্যাণকর। শুধু রাজনৈতিক ও প্রচারসর্বস্ব ইশতেহার হলে চলবে না।

আফগান জনগণকে লক্ষ করে আমীরুল মুমিনীন বলেন, আফগান জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, তারা যেন ইসলামের প্রতিটি বিধান বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়। নিষ্ঠার সাথে আমল করে। ইসলামের রশি মজবুতভাবে আঁকড়ে রাখে। ভুল ধ্যান-ধারনা ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ভুত চূর্ণ করতে হবে। একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সর্বতভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা ও কুরবানীর ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি আমাদের থেকে কাম্য নয়।

আস-সাহাব মিডিয়ায় পাকয়িতয়া প্রদেশের সামরিক শাখার প্রধান মৌলভী সানজীনের সাক্ষাৎকার

আস-সাহাব : আমরা খুব গর্ববোধ করছি যে, আজকের এই মোবারক দিনে আমরা সাক্ষাৎ করতে এসেছি পাকতিয়া প্রদেশের সামরিক শাখার প্রধান 'জনাব মৌলভী সানজীনে'র সাথে। জনাব সানজীনের প্রধান পরিচয়, তিনি আফগান ভূমিতে ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রথম সারির একজন মুজাহিদ।

প্রথমেই আমরা হযরতের কাছে জানতে চাই এই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে আপনাদের প্রস্তুতি কেমন?

মৌলভী সানজীন : নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা...

আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলার জন্য আসে, তখন দুনিয়ার প্রায় সবগুলো দেশ তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়। এদের মাঝে কয়েকটি দেশও ছিল। আমেরিকা নিজেকে বড় বিচক্ষণ ও চতুর ভাবে। অথচ তারা একটুও ভেবে দেখেনি যে, আফগান যুদ্ধে জড়ানোর মাধ্যমে তারা কোন ফাঁদে পা দিয়েছে। এখানে তাদেরকে প্রতিরোধ করা হতে পারে, সে কথা তারা কখনও কল্পনাও করেনি। কিন্তু মহান আল্লাহর অনুগ্রহে যখন ইসলামী ইমারতের মুজাহিদগণ তাদের প্রতিরোধ শুরু করে, তখনই তারা আফগান ছেড়ে পালানোর জন্য চেচামেচি শুরু করে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে এ বছর মুজাহিদগণ আমেরিকার ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান হল সে অভিজ্ঞতার, যা মুজাহিদগণ অর্জন করেছেন ধারাবাহিক কয়েক বছর প্রতিরোধ যুদ্ধের ময়দানে। এ অভিজ্ঞতার আলোকে আমেরিকার গৃহীত পরিকল্পনার বিপরীতে তারাও কিছু যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। ফলে প্রতিরোধযুদ্ধে মুজাহিদদের কার্যধারায় নতুন চাঞ্চল্য শুরু হয়। ইনশাআল্লাহ, সব অঞ্চলেই আমেরিকানদের প্রতিরোধ আরও জোরদার হবে। ইসলামী ইমারত এ সংকল্পও করেছে যে, এই ব্যাপক ও বিস্তৃত যুদ্ধে যত ধরণের প্রস্তুতি ও উপকরণ প্রয়োজন, তা সবই সরবরাহ করে যাবে।

আস-সাহাব : কিছুদিন আগে আমেরিকার সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার এক ভাষণে বলেছেন, 'তার সরকার আফগানিস্তানে বেশিদিন এ যুদ্ধ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?

মৌলভী সানজীন : বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে রাশিয়া আফগান ভূমিতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের পালিয়ে যাওয়ার পর বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি। তাদের এ পালানোর মধ্যে আমেরিকার জন্য উপদেশ ছিল 'সাবধান! তোমরা আফগানিস্তানে যুদ্ধে জড়িয়ো না।' কিন্তু আমেরিকার বিধি বাম। তারা এ উপদেশ বাণী কানে তোলেনি। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বড় বড় যুদ্ধাস্ত্রের প্রতি। ভারী ভারী সামরিক সরঞ্জামাদির প্রতি। এজন্যই তারা উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। দম্ভভরে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এখন তাদের অবস্থা গলায় হাড় আটকানো গাধার মত।

ইনশাআল্লাহ! অচিরেই আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে পালাতে বাধ্য হবে। তখন তাদের অবস্থা হবে যুদ্ধে বিধ্বস্ত চূর্ণবিচুর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর একটি রাষ্ট্রের মত।

রাশিয়ার পরিণতি আমেরিকাসহ দুনিয়ার সবার কাছে স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও আমেরিকা তার সমরশক্তির কারণে প্রতারিত হয়েছে। কিংবা কেউ তাকে প্রতারিত করেছে। কাজেই সে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এখন আল-হামদুলিল্লাহ! মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধ তুঙ্গে।

আমেরিকানদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, আফগান ভূমি ও আফগান জাতি কখনই কাফেরের দখলদারিত্ব মেনে নেয়নি।

রাশিয়া খুব দ্রুতই আফগান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। বুশ নিজেও তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় অচিরেই আমেরিকা পরাজিত হবে। এখনই তারা পালানোর রাস্তা খুঁজছে। কারণ, এ পবিত্র ভূমিতে তাদের পা রাখার জায়গা হচ্ছে না।

আস-সাহাব : জনাব, আপনাদের অধিকৃত অঞ্চল পাকতিয়া প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাবেন কি? এখানে মুজাহিদদের কার্যক্রম কিভাবে চালু আছে?

মৌলভী সানজীন : আল-হামদুলিল্লাহ! তালেবানদের সামরিক বিভাগ যখন থেকে এ অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন থেকেই এ প্রদেশের প্রতিটি জেলা ও থানা কেন্দ্রিক মুজাহিদ বাহিনী তৈরি করে। এ বাহিনীগুলোতে শুধু যোগ্য ও দক্ষ মুজাহিদদেরকেই নেওয়া হয়। সামরিক যোগ্যতার বাইরে অন্যকিছুই এখানে দেখা হয়নি। প্রতিটি শাখা পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একেকজন সমরবিদ বিচক্ষণ কমাণ্ডারকে। তা ছাড়া প্রত্যেক মুজাহিদের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রত্যেক মুজাহিদকে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধের নিত্যনতুন কৌশলের ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষত দূর থেকে বিস্ফোরণ ও অন্যান্য নতুন সামরিক টেকনিক শেখানো হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, পাকতিয়া প্রদেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিরোধ যুদ্ধ উত্তরোত্তর মজবুত ও প্রচণ্ড হতে থাকবে।

আস-সাহাব : তানযীম আল কায়েদার ভাইদের সাথে আপনাদের সম্পর্কে কেমন? আপনাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি কতটুকু?

মৌলভী সানজীন : আল-হামদুলিল্লাহ! আল-কায়েদা ও তালেবান, আমরা সবাই মুসলমান। ইসলাম আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমরা কখনও এই পার্থক্য দেখি না যে, অমুক তালেবান আর অমুক আল-কায়েদার সদস্য। প্রত্যেকেই ইসলামের পরিচয়ে পরিচিত। আল-কায়েদার আমীর শায়খ উসামা বিন লাদেন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের হাতে বাইয়াত নিয়েছেন। একাধিক বার আমীরুল মুমিনীনের নেতৃত্বকে সমর্থন করেছেন ও তার বাইয়াত দৃঢ় করেছেন। আমাদের মাঝে কোন বিভেদ নেই। আমরা সবাই মুসলিম ভাই ভাই। ইসলামী শরীয়তের অনুসারী। যেমনইভাবে দুনিয়ার সমস্ত কাফের এক জাতি; তেমনি আমরা সকল মুসলিমও এক জাতি। শত্রুতা কখনও আমাদের মাঝে ফাটল ধরাতে পারবে না।

অনেকে বলে, এরা তো তালেবান, এরা কিছুটা ভালো ও অহিংস্র, বা ভিনধর্মীদের প্রতি সহনশীল। আর এরা হল আলে-কায়েদা। এরা উগ্রপন্থী, কঠোর মনোভাবের অধিকারী। এসব বুলির অন্তরালে তাদের টার্গেট হল আমাদের মাঝে ফাটল ধরানো। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তারা কখনও সফল হবে না। তাদের এসব কুমতলবদুষ্ট বুলিসমূহ আমাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে কোন প্রভাব ফেলবে না।

এখন আবার তারা ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। স্বয়ং তালেবানদের মাঝে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টায় মেতেছে। ইহুদী তল্পিবাহক মিডিয়াগুলো প্রচার করছে তালেবানরা সব এক রকম নয়। তাদের মাঝে একদল আছে উগ্রপন্থী, আরেক দল মধ্যপন্থী। কিন্তু প্রকৃত কথা হল আমরা সবাই এক। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য আমরা কখনও বিনষ্ট হতে দেব না, ইনশা আল্লাহ।

আস-সাহাব : মুজাহিদদের প্রতিরোধের মুখে আমেরিকান সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে ব্যাপকভাবে হামলা শুরু করেছে। ক্রোধ মিটানোর জন্য তারা বেসামরিক লোকজন বিশেষত নারী, শিশু ও পথচারীকে টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে। মুজাহিদদেরকে সহায়তা করার অপরাধে বেসামরিক লোকজনের দোকান, পাট, ঘর-বাড়ি ও বিবাহ অনুষ্ঠানে বোমা বর্ষণ করছে।

জনাব, আপনি আমাদেরকে আমেরিকার এ পৈচাশিক নির্যাতনের কিছু বিবরণ শুনাবেন কি?

মৌলভী সান্‌জীন : আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলার সূচনা করে, তখন তাদের মুখের বুলি ছিল, তারা আফগানিস্তানে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা

প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন তারা মুজাহিদদের কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়, তখন তারা ভালো করেই বুঝে নেয় যে, আফগান জাতির সাথে কোনভাবেই তাদের সখ্য হবে না। রুচিগতভাবেও না; ধর্মীয়ভাবেও না। একটি বিষয় তাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আফগান জাতিকে কোনভাবেই মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের কোটি কোটি ডলার আর দানবসদৃশ যুদ্ধসামগ্রী কোনই প্রভাব ফেলতে পারবে না। তারা বুঝতে পারে যে, আফগান ভূমিতে তাদের শেষ পরিণতি হল পরাজয় ও লাঞ্ছনা। তাই তারা পুরো আফগান জাতির সাথে ঘোরতর শত্রুতা শুরু করে। মুজাহিদ ও সাধারণ নাগরিক উভয় শ্রেণীকেই তারা টার্গেট বানাতে থাকে। আফগানিস্তানে তাদের যুদ্ধনীতি হল, আফগান জাতির প্রতিটি সদস্যের রক্ত আমাদের জন্য বৈধ।

তাদের পূর্ববর্তী তথা রাশিয়ানরাও এমনই করেছিল। যখন দেখছিল যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন তারা নিজেদের আসল চেহারা প্রকাশ করে। পশুবৃত্তির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এলোপাতাড়ী হামলা চালাতে থাকে। নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ সাধারণ জনগণের ঘরবাড়ির উপর চলতে থাকে বোমা বর্ষণ। এখন এই পশুবৃত্তির ক্ষেত্রে আমেরিকাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। ইনশাআল্লাহ, আমেরিকাকেও সেই পরিণতিই ভোগ করতে হবে। রাশিয়া তো পালানোর পথ পেয়েছিল, আমেরিকাকে সেই সুযোগও দেওয়া হবে না।

আস-সাহাব : আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ক্রুসেডার বাহিনী ও তাদের সহযোগী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান কেমন? এবং তাদের কাজের গতি কেমন?

মৌলভী সানজীন : আল-হামদুলিল্লাহ! দখলদার আমেরিকা ও তার সহযোগী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান খুবই দুর্বল। এমন কি তারা তাদের সেনা ছাউনীর বাহিরে যাওয়ারও সাহস পায় না। তারা তাদের ক্যাম্পগুলোর ভিতরে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তাদের কাছে খবর পৌঁছানো হয় যে, মাত্র এক দুই মাইল দূরে মুজাহিদরা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু তাদের মনোবল এতটাই ভেঙে পড়েছে যে, এই এক দু মাইল সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পায় না।

ক্রুসেডার বাহিনীর ক্ষমতা শুধু তাদের সামরিক ছাউনীগুলোর ভিতরেই সীমিত। আর মুরতাদ সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ভবনের চার দেয়ালের মধ্যে। সাধারণ জনগণের উপর তাদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা প্রভাব

বলতে কিছুই নেই। সাধারণ জনগণ তো এখন বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের জন্য তালেবানদেরই দ্বারস্থ হচ্ছে। আর মুরতাদ সরকারের বিভিন্ন বাহিনী জায়গায় জায়গায় মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করছে। অনেক সেনা সদস্য পত্রমারফত তালেবানদেরকে তাদের আত্মসমর্পণের কথা জানাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এই বছর শত্রুর অবস্থা অনেক শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ইনশা আল্লাহ, অতিসত্বর তারা ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে।

আস-সাহাব : আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (হাফিযাহুল্লাহ)-এর ব্যাপারে দু এক বাক্য বলবেন কি?

মৌলভী সানজীন : আল-হামদুলিল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের মাঝে কোন হতাশা বা দুর্বলতাবোধ নেই। তিনি এই পরীক্ষা ও মহাবিপদের সামনেও ইস্পাত কঠিন; দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মোকাবেলায় অটল। আমরা তার কাছে আশাবাদী তিনি শেষ পর্যন্ত অটল ও দৃঢ় থাকবেন। আর এ পথ ধরেই আসবে আমিরকার পতন। এ যুদ্ধের সূচনাতেই আমীরুল মুমিনীনের প্রতীক ছিল পবিত্র এই আয়াতখানা–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমরা হীনবল হয়ো না এবং বিচলিত হয়ো না। তোমরাই হবে জয়ী। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।[৬]

আল-হামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত তিনি এই প্রতীকের উপরই অটল আছেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে চলছেন; প্রার্থিব কোন বস্তুর উপর নয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমীরুল মুমিনীনের এই দৃঢ়তার ফলেই আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব লজ্জাস্কর পরিণতির শিকার হচ্ছে।

আস-সাহাব : সবশেষে আমরা আশা করব, আপনি বিশ্বের সকল মুজাহিদ ভাইদের লক্ষ করে কিছু বলবেন।

মৌলভী সানজীন : প্রতিটি মুসলিম ও প্রতিটি মুজাহিদদের প্রতি আমার আহ্বান হল, আপনারা আল্লাহ তাআলার এই পবিত্র আয়াতখানা আঁকড়ে ধরুন–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

---

[৬] সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

আমেরিকা অচিরেই পরাজয়ের চাদরে আবৃত হবে। সমস্ত মুসলমানের কাছে সাধারণভাবে, আর মুজাহিদদের কাছে বিশেষভাবে আমার আবেদন থাকবে, তারা যে উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছে তা যেন চালু রাখে। তা হল আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার নববী প্রচেষ্টা। সবসময় আল্লাহমুখী হয়ে থাকতে হবে। নিজেদের মাঝে ঐক্য বহাল রাখতে হবে।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমরা শহীদদের পবিত্র রক্তের সাথে খিয়ানত করো না। এতীম আর বিধবাদের অসহায়ত্বের সাথে প্রতারণা করো না। তোমরা তোমাদের আকীদা, বিশ্বাস ও দীনকে মজবুত করে ধরো। এটাই আমি তোমাদের কাছে আশা করি। আর বেশি দিন ধৈর্য ধরতে হবে না। অচিরেই কুফরী শক্তি পরাজিত হবে। লাঞ্ছিত হয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। মুজাহিদ ভাইদের করণীয় শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা আর পার্থিব মোহ পরিত্যাগ করা।

ইনশা আল্লাহ, ইসলামের বিজয় অত্যাসন্ন আর কুফরের পরাজয় সুনিশ্চিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তার পছন্দের পথে জান মাল উৎসর্গ করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কমিশন ও তালেবানদের প্রতি অপবাদ

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কমিশনের পক্ষ হতে তালেবানদের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়, 'তারা যেন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে। সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেয়। এবং সারা দেশব্যাপী কার্যকর সরকার গঠন করে।'

কমিশনের এই অভিযোগের বাস্তবতা জানার জন্য 'যরবে মুমিন' পত্রিকা নিউ ইয়র্কের সাথে যোগাযোগ করে। জাতিসংঘের কাছে প্রেরিত তালেবান রাষ্ট্রদূত মৌলবী আদুল হাকীম মুজাহিদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, এ প্রস্তাব মূলত পেশ করেছে রাশিয়া। এ প্রস্তাব অত্যন্ত আক্ষেপজনক। রাশিয়ার উদ্দেশ্য, জাতিসংঘের বদনামের ক্ষেত্র তৈরী করা।

উক্ত রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, শান্তি রক্ষা কমিশনের এ প্রস্তাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, জাতিসংঘ আফগানিস্তানে নিরাপত্তার পরিবেশ সহ্য করতে পারছে না। তিনি বলেন, এই প্রস্তাবে কুমতলবের দূর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় বিবিসি উর্দু সার্ভিসে পেশাওয়ারের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ইসলামঈল খানের বরাত দিয়ে বলা হয়, যখন তিনি তালেবানদের

কাছে শান্তিরক্ষা কমিশনের প্রস্তাবের জবাব জানতে চান, তখন তালেবান মুখপাত্র অকীল আহমদ বলেন, আমরা সকল অভিযোগের সমাধান কুরআন-হাদীস মোতাবেক করব। এ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আফগান সুপ্রিম কোর্টের সাথে আলোচনা করা হবে। সাংবাদিক ইসমাঈল খান আমীরুল মুমিনীনের উপদেশ বরাত দিয়ে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরই তারা এর জবাব দিবেন।

মৌলভী অকীল আহমদ বিবিসি পশতু সার্ভিসের সাথে আলাপকালে এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন, ইসলামী ইমারতের উপর সন্ত্রাসবাদ, বা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দান সংক্রান্ত অভিযোগ, একেবারেই ভিত্তিহীন। বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারটি সুপ্রিম কোর্টের অধীনে সমাধান করেছি।'

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে দুটি মূলনীতি কাজ করে।

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের সকল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ যে সঠিক, স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত, তা কেউ বুঝবারও চেষ্টা করছে না। জাতিসংঘ যতক্ষণ পর্যন্ত আফগান জনগণের অধিকার, দাবি-দাওয়া মেনে না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা ও প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে বোঝানা যাবে না। তারা বলছে, নারী অধিকার বিষয়ে আমরা না কি ইসলামের দিক নির্দেশনা মানছি না; বরং শরয়ী সীমা লংঘন করছি।

প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি, 'শরীয়তের গণ্ডির ভিতরে থেকেই আমরা নারী অধিকার নিশ্চিত করব। এ ক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালার চুল পরিমাণও এদিক সেদিক হবে না।'

আরব শায়েখের মূল্যবান গাড়ি হাদিয়া ও আমীরুল মুমিনীনের প্রত্যাখ্যান

হজ্জ ও ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের প্রধান মুফতী, মৌলভী মুহাম্মাদ মাসুম বলেন, একবার মধ্যপ্রাচ্যের একজন ধনী শায়েখ আমীরুল মুমিনীনকে বারোটি গাড়ি হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। আমীরুল মুমিনীন তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এমন কি সেই শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি তিনি।

মুফতী মাসুম বলেন, আমীরুল মুমিনীন ব্যক্তিগতভাবে গাড়িগুলো গ্রহণ না করায় সেই আরব শায়েখ গাড়িগুলো ইসলামী ইমারতের সরকারী ফাণ্ডে দান করে দেন। পরবর্তীতে সরকারী বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়িগুলো বণ্টন করে দেওয়া হয়। আমীরুল মুমিনীনের চাচা মোল্লা মুহাম্মাদ আন্ওয়ার সংসারের খরচ বাড়ার কারণে নিজের মালিকানাধীন শেষ সম্বল গাড়িটিও বিক্রি করতে বাধ্য হন। আমীরুল মুমিনীনের সাংসারিক অবস্থা ছিল অনেক দৈন্যের শিকার, তা সত্ত্বেও বাইতুল মাল থেকে একটি পয়সাও তিনি গ্রহণ করতেন না। আমীরুল মুমিনীনের বয়স যখন তিন বছর, তখনই মাথার উপর থেকে পিতৃছায়া উঠে গিয়েছিল।

অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সর্বপ্রথম এক সাহসী বিবৃতি

ইসলাম ও মুসলমানদের সেবক আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর পবিত্র মাস রমযানের আগমন উপলক্ষে জনসাধারণকে লক্ষ করে এক বিবৃতি দেন। এতে তিনি পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত খুলে খুলে বর্ণনা করেন। আমীরুল মুমিনীনের এই বিবৃতি ছিল বিগত পঞ্চাশ বছরে একটি স্বতন্ত্র ও দুঃসাহসী পদক্ষেপ। মুসিলম উম্মাহর বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে মুসলমানদের কোন নেতা সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এত বড় সাহস দেখাতে পারেননি।

আমীরুল মুমিনীন জাতির উদ্দেশে বলেন, আন্তর্জাতিক সংগঠন 'জাতিসংঘ' ইসলাম বৃক্ষের গোড়ায় করাত চালিয়ে যাচ্ছে।

সংবাদ-মাধ্যমগুলো আমীরুল মুমিনীনের এই ঐতিহাসিক বিবৃতির সাথে কানে তুলা দেওয়ার আচরণ করে। যেন কিছুই বলা হয়নি। এটাও তাদের চক্রান্তেরই একাংশ। মুসলিম বিশ্বের নেতাগণ জাতিসংঘের পবিত্রতা রক্ষাকে নিজেদের আবশ্য কর্তব্য মনে করেন। তাই মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ এ বিবৃতি নিয়ে বিষোদাগার শুরু করেন। এবং একে ইসলামী ইমারতের বাড়াবাড়ি ও উগ্রতা বলে মন্তব্য করেন।

এখানে ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে জাতিসংঘের আসল চেহারা তুলে ধারা এবং উপরোক্ত বিবৃতির যথার্থতা প্রমাণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

জাতিসংঘের গুণগ্রাহী মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের বলব, তারা যেন খোদাপ্রদত্ত বিবেক ও দৃষ্টি শক্তির সমন্বয়ে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা একটু দর্শন

করেন। অসহায় মুসলিম জাতি কাফেরদের নগ্ন থাবায় আহত হরিণের ন্যায় কোকাচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা তাদের চতুর্দিকে অনিরাপত্তা ও ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা একের ঘরেও নয়; দশের ঘরেও নয়। বাহ্যিকভাবে মুসলমানরা স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে তারা টাকায় কেনা গোলামের চেয়েও নিকৃষ্ট দাসত্বের জীবন পার করছে। আজ আমাদেরই পলিসি নির্ধারণ করছে শত্রুরা। এমন কি নিজেদের মালিকানাধীন দ্রব্যসমূহের মূল্য নির্ধারণেও আমরা তাদের কাছে দায়বদ্ধ। কী সেই শক্তি, যা আজ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে রোবট বানিয়ে রিমোট দ্বারা কন্ট্রোল করছে। তাদের যা ইচ্ছে হবে, তাই করে যাবে। আমাদের 'উহ' শব্দটুকু মুখে আনার অধিকার নেই।

এক কুলাঙ্গার আমেরিকান তো এতটুকুও বলে ফেলেছে যে, মুসলিম জাতির ইতিহাস যতই উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ হোক না কেন, বর্তমান বিশ্বে তাদের অবস্থা একটি ভেজা বিড়ালের মত, যা শীতের রাতে বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে আর গোঙ্গাচ্ছে। তাকে আশ্রয় দেওয়ার মত কেউ এগিয়ে আসছে না। জাতিসংঘের তল্পিবাহক মুসলিম শাসকরাই। যখনই কোন মুসলমান আল্লাহর মহান হুকুম জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর আওয়াজ তোলে, তখনই এই আন্তর্জাতিক কুফরী প্রতিষ্ঠানটি সন্ত্রাসবাদের নামে চেচামেচি শুরু করে।

যখনই কোন রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে, তখনই ইউএন সন্ত্রাস দমনের জন্য ছড়ি নিয়ে নর্তন-কুর্দন শুরু করে। যখনই কোন দেশের নিপীড়িত মুসলিমের সাহায্যের চেষ্টা করা হয়, তখনই ইউএন বলতে শুরু করে, পরের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ। যা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ। ইসলামের আদর্শ দণ্ডবিধি, হুদুদ-কেসাসের প্রসঙ্গ এলেই তাদের জিহ্বায় এলার্জি শুরু হয়। নিলর্জ্জের মত বলতে শুরু করে, এসব বিধি-বিধান তো মানবতা পরিপন্থী।

মহিলাদের জন্য ইসলামের সুশীল বিধান পর্দার আলোচনা উঠলেই তাদের গা জ্বলা শুরু হয়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শুরু করে নারীঅধিকারের নামে অশ্রাব্য কথাবার্তা। যদি কোন মুসিলম দেশ আল্লাহর নির্দেশ– وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী সমরশক্তিপ্রস্তুত করে রাখো।) এর উপর আমল করার উদ্দেশ্যে আধুনিক অস্ত্র তৈরী করে,

তখন এই কুফরী সংস্থা তাৎক্ষণিক তাদের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসে।

উপরে বর্ণিত মন্দকর্মগুলোই যথেষ্ট ছিল তাদের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের উক্তি যথার্থ হওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তব কথা হল, জাতিসংঘের ইতিহাস পুরোটাই ইসলাম বিদ্বেষ দ্বারা ভরপুর। আমরা যদি আফগান যুদ্ধ চলাকালীন কয়েক বছরে জাতিসংঘের কার্যক্রমের দিকে তাকাই, তা হলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিচে তাদের এ জাতীয় কিছু দুষ্ট কর্মের আলোচনা করছি।

মুজাদ্দিদে যামান শায়খ উসামার ভাষায় ইউএন-এর গোমর ফাঁস

১. আন্তর্জাতিক জিহাদের প্রাণপুরুষ ইয়েমেন বংশোদ্ভুত সৌদি আরবের ধনকুবের শায়খ আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন বলেন, আফগান জিহাদ যখন শেষ পর্যায়ে এবং মুজাহিদগণ দিন দিন তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আচানক তেড়ে আসে ইউএন। আগে বেড়ে আদ্যোপান্ত অযৌক্তিক একটি যৌথ সরকারের ফর্মূলা পেশ করে। শায়খ উসামা বলেন, আমরা এ সংবাদ শুনে দিশেহারা হয়ে পড়ি। কারণ, এটা এমন একটা প্রস্তাব, যেখানে ৫০ ভাগ নেতৃত্ব থাকবে মুজাহিদদের হাতে আর ৫০ ভাগ কমিউনিষ্টদের হাতে। অসম্ভব হওয়ার পরও জিহাদী সংগঠগুলোর নেতারা এতে স্বাক্ষর করেন। সবার স্বাক্ষর করা শেষ। শুধু ইউএনের জেনারেল সেক্রেটারীর স্বাক্ষর বাকী। তিনি শুক্রবার স্বাক্ষর করবেন।

শায়খ উসামা এ সংবাদ জানতে পারেন সোমবার দিন। সংবাদ পাওয়ার পরই তিনি আন্তর্জাতিক মানের বড় বড় আলেমদের থেকে এ বিষয়ে ফতোয়া নিয়ে এ অযৌক্তিক ও চক্রান্তপূর্ণ প্রস্তাবের বিপরীতে কোমর বাঁধেন। আল্লাহর সাহায্যে জাতিসংষের চক্রান্ত মাঠে মারা যায়।

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ উসামা জিহাদী নেতা সাইয়াফের সাথে এক সাক্ষাতে এই স্বাক্ষরের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে সাইয়াফ বললেন, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আমাদের উপর সীমাহীন চাপ প্রয়োগ করা হয়। বলা হয়, যদি আমরা তাদের প্রস্তাবিত এ ফর্মূলা না মানি, তা হলে সরকার ব্যাবস্থায় আমাদের কোন অংশই দেওয়া হবে না।

মাসউদ দোস্তম জোট, জাতিসংঘের কারসাজি

আগের চক্রান্তে ব্যর্থ নতুন চক্রান্তের ফন্দি আঁটে জাতিসংঘ। আফগানিস্তানে নিয়োজিত তাদের বিশেষ প্রতিনিধি এক কট্টর ইহুদীকে একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে। তার কাজ হল উত্তরাঞ্চলের প্রভাবশালী উজবেক নেতা জেনারেল দোস্তম এবং উতরাঞ্চলেরই আরেক তাজিক কমাণ্ডার আহমদশাহ মাসউদের মাঝে জোট তৈরী করা। প্রথমজন মতাদর্শগতভাবে একজন কমিউনিষ্ট। আর দ্বিতীয় জনের সাথে রাশিয়া ও কেজিবি'র সম্পর্ক ছিল অনেক পুরনো। আফগানিস্তানের একটি বৈশিষ্ট্য, এখানে শাসনক্ষমতা তার হাতেই থাকবে, যার সামরিক শক্তি মজবুত। 'জোর যার মল্লুক তার' এ প্রবাদটি আফগানজাতির সাথেই পরিপূর্ণভাবে খাপ খায়। রাজনৈতিক পলিসি ও কুটনৈতিক শক্তিগুলোর এখানে কোন প্রভাব ছিল না। তাই ইউএন বুদ্ধি করে সামরিক শক্তিগুলোকে তিন মেরুতে ভাগ করে ক্ষতার দখলের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে দেয়। তিন মেরুর এ শক্তিগুলো বুঝে কিংবা না বুঝে আমেরিককা ও রাশিয়ার কল্যাণে কাজ করতে থাকে। এ কারণেই অনিরাপত্তা, হত্যা, লুণ্ঠন, নৈরাজ্য এবং সরকার ব্যাবস্থা খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘ রব্বানীর সরকারকে জিইয়ে রাখে। এতে একদিকে জাতিসংঘের আশা পূরণ হয় যে, ১৬ লক্ষ আফগান শহীদ হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তান ইসলামী শাসন থেকে বঞ্চিত হয়। অপর দিকে আহমদশাহ মাসউদ উত্তরাঞ্চলকে জিহাদের কেন্দ্র বানাতে বাধা হয়ে দাঁড়ান। মাসউদ দক্ষতা ও অর্থ খরচ করে জিহাদী উদ্দীপনা নিঃষেশ করতে বড় ধরণের ভূমিকা পালন করেন। এবং দুনিয়াব্যাপী জিহাদ ও মুজাহিদদের দুর্নাম করে ছাড়েন।

মোজাদ্দেদীকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর কারণ

শায়খ উসামা বিন লাদেন বলেন–

৩. জাতিষংঘ পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে, তাদের পছন্দনীয় নেতা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীকেই রাষ্ট্রপ্রধান বানাতে হবে। শেষমেষ তারা এই চক্রান্তে সফল হয়। মুজাদ্দেদীর সংগঠন সবচেয়ে দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘের পীড়াপীড়ি করার উদ্দেশ্য ছিল শাসন ক্ষমতায় এমন এক নেতাকে আনা, যাকে আহমদশাহ মাসউদ ও জেনারেল দোস্তম রিমোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

তাজিকিস্তানের জিহাদ, জাতিসংঘের চক্রান্ত

৪. আফগান জিহাদের বরকতে তাজিকিস্তানের জিহাদ শুরু হয়। সবাই আশা করতে থাকে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের ঘোর অমানিষা এখন জিহাদ ও ইসলামের আলোতে কেটে যাবে। কিন্তু এই জিহাদের তৎপরতা চিরতরে বন্ধ করার জন্য শুরু হয় আহমদশাহ মাসউদ ও জাতিসংঘের যৌথ ষড়যন্ত্র। একদিকে মাসউদ তাজিক কমিউনিষ্টদেব সাথে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে মুজাহিদদের নিরস্ত্র করতে শুরু করেন। অপরদিকে ইউএন মুহাজিরদের সহায়তার পথে হাজারো শর্ত আরোপ করে বসে। দিনের পর দিন ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্যকারী মুজাহিদ ও মুহাজিরদরকে শুধু এক আমীরের অধীনে একতাবদ্ধ হওয়ার অপরাধে বিভিন্ন প্রকারে শাস্তি দেওয়া হয়।

তাজিক মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় শুরু কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, প্রধান বিচারপতি মাওলানা আবদুল গাফফার মুফতী আজম রশীদ আহমদকে বলেন, ইউএন মুজাহিদদেরকে সহায়তার জন্য এই শর্ত আরোপ করে যে, তাদের চারদলে বিভক্ত হতে হবে। এ শর্ত মানলেই তারা সহায়তা দিতে প্রস্তুত; অন্যথায় তাদের ফাণ্ড থেকে একটি পয়সাও বের হবে না।

তাজিক মুজাহিদগণ বড় সাহসের প্রমাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তাদের লিডার বিক্রি হয়ে যায়। আহমদশাহ মাসউদ ইরানের সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন এবং যৌথভাবে রাশিয়ার মনোবাসনা পূরণ করার জন্য এই জিহাদের গলা চেপে ধরেন। অপরদিকে আব্দুল্লাহ নূরী মস্কোতে এক অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে। যাতে বলা হয় যে, ৭০ শতাংশ সিট পাবে কমিউনিষ্টরা, আর বাকী ৩০ শতাংশ পাবে মুজাহিদগণ। 'যরবে মুমিন' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ নূরী স্বাক্ষরিত সেই অঙ্গীকারপত্রটি স্বচক্ষে দেখেন।

আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘের সমস্ত কর্মকর্তা ইহুদী

৫. ইউএন আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য যত প্রতিনিধি প্রেরণ করে, তারা সবাই হয়তো প্রকাশ্য কট্টর ইহুদী, অথবা পর্দার আড়ালে ইহুদীদের এজেন্ট। আফগানিস্তানের সমস্যা সমাধানে ইহুদীরা কখনও নিষ্টাবান হতে পারে না।

৬. যখন তালেবানরা পশ্চিম আফগানিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম

হয়, তখন তারা সংখ্যাধিক্যের মূলনীতি অনুযায়ী জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানায় যে, জাতিসংঘ যেন নামমাত্র শাসক রব্বানীর সরকারকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। কিন্তু জাতিসংঘ খোড়া যুক্তি দিয়ে বলে, রাজধানীর উপর যার নিয়ন্ত্রন রয়েছে জাতিসংঘ তার সরকারকেই সমর্থন করে। আর রাজধানী যেহেতু এখনও রাব্বানীর হাতেই রয়েছে, এজন্য তার সরকারই আমাদের দৃষ্টিতে বৈধ সরকার। কিন্তু তালেবানরা যখন রাজধানী কাবুলকেও জয় করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়, তখন ইসলাম বিদ্বেষী এই কুফরী সংস্থাটি নিজেদের বানানো যুক্তিকেই নিলর্জ্জের মত অস্বীকার করে এবং তালেবান সরকারকেক সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তালেবান ও নোবর্ট হল

৭. ইসলামাবাদে এক বৈঠকে তালেবানরা জাতিসংঘের এক কমিশনার নোবর্ট হলকে প্রশ্ন করেন, সবদিক বিবেচনায় সমর্থনযোগ্য তালেবান সরকারকে আপনারা সমর্থন দিচ্ছেন না কেন? তখন নোবর্ট হল জানায়, ওআইসি যদি আপনাদের মেনে নেয়, তা হলে আমরাও মেনে নেব।

এমন সময় তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ গাউস আখুন্দ বলেন, যদি ওআইসি আপনাদের কাছে মূল যুক্তি হয়ে থাকে, তা হলে প্রতিষ্ঠানটি তো রব্বানীর সরকারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। তাদের অনুকরণে আপনারাও তাই করুন।

এ সময় নোবর্ট হলের মুখে তালা পড়ে যায়। সে আর কোন জবাব খুঁজে পায় না। فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

ষাট হাজার নিরপরাধ মানুষ হত্যাকারীদের শাসন সমর্থন মুসলিম উম্মাহর সাথে পরিকল্পিত প্রহসন

৮. তালেবান আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে জিহাদ ও মুজাহিদদের বদনামের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ মাসউদ, হেকমতিয়ার, সাইয়াফ ও রব্বানীকে ব্যবহার করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বাঁধিয়ে পুরো আফগানিস্তানে অনিরাপত্তা, লুটতরাজ, হত্যা ও ক্ষমতা ভাগাভাগির পরিস্থিতি জিইয়ে রাখে। এ সময় জাতিসংঘ জিহাদের বিরুদ্ধে এত জোরদার প্রোপাগাণ্ডা চালায় যে, যেন প্রতিষ্ঠানটি আসমান মাথায় নিবে। এর ফলে সবার শ্রদ্ধার পাত্র মুজাহিদদের অন্যের সামনে মুখ দেখানোও দুষ্কর হয়ে পড়ে। হতাহতদের

সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান জেনারেল এসেম্বিলিতে উত্থাপিত হতে থাকে। জাতিসংঘের রিপোর্ট মতে হেকমতিয়ার, মাসউদ, সাইয়াফ, হিযবে ওয়াহদাত ও দোস্তমের পারস্পরিক সংঘাতে দৈনিক ৩৮, মাসে ১১৩২, আর বছরে ১৩,৫৮৪ জন নিহত হয়। সে মতে ৫৩ মাসে প্রায় ষাট হাজার নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। এতসব ক্ষয়ক্ষতির অবসান ঘটানোর জন্য যখন শান্তির দূত হয়ে তালেবানরা মাঠে নেমে আসে এবং সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের হটিয়ে একটি সরকার গঠনের পর্যায়ে পৌঁছে, তখন ধূর্ত জাতিসংঘ পরামর্শ দেয় সেই পাপিষ্ট শাসকদেরকেও সরকার ব্যাবস্থায় রাখতে, যাদের হাত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

কাবুলে জাতিসংঘের দফতর এবং মাসউদের পক্ষ্যে গুপ্তচরবৃত্তি

৯. জাতিসংঘের কাবুল দফতরের দায়িত্বশীল আহমদশাহ মাসউদের পক্ষ্য হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে থাকে। এ অপরাধে তালেবানরা তাকে গ্রেফতার করে।

গোয়েন্দা তথ্যসম্বলিত জাতিসংঘের গোপন ফাইল

১. আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সাটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক ও সর্বোচ্চ পদের অধিকারী 'টাররাথ'কে কান্দাহার থেকে গ্রেফতার করা হয়। কারণ সে তালেবানের গোয়েন্দা তথ্যসম্বলিত ফাইল নিইইয়র্কে পাঠানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটা তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভী রহমতুল্লাহর হাতে পড়ে যায়। একটি পত্রে তিনি দেখতে পান যে, তাতে লেখা আাছে, 'আমদের পক্ষ থেকে পরামর্শ হল, সামনে তালেবানদের সাথে যখনই কোন বৈঠক হবে, তখন অপরূপ সুন্দরী নগ্ন নারী সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। এ পন্থা ছাড়া তাদেরকে বিভ্রান্ত করার কোন পথ নেই।'

সেই ফাইলে আরও বলা হয়, 'তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে যেন কোন ধরণের সেবামূলক কাজ না করা হয়। করলে কাজটি হবে উলুবনে মুক্তো ছিটানোর মত।'

জাতিসংঘের অফিসারকে বের করে দাও

১১. ছয় মাস আগে যখন আহমদশাহ মাসউদ 'গুল বাহার' ও 'জাবালুস সিরাজ' নামক অঞ্চল দুটিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন ইউএন তার দফতর ও কর্মীসমূহকে কাবুল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। 'যরবে মুমিন' পত্রিকার

বিশেষ প্রতিবেদক এ সময় কাবুলে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, ইউএন এ সময় এমন ভাব নিয়ে কাবুল থেকে ত্যাগ করে, যা জনসাধারণের মনে ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করে। এবং তালেবানদের মনোবল ভাঙার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কিন্তু এর বিপরীতে তালেবানরা যখন কাবুল থেকে মাত্র ১৪ কি. মি. দূর মাযার এয়ারপোর্টে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন ইউএন ঘোষণা দেয় 'মাযার অঞ্চলস্থ তাদের দফতর বন্ধ হবে না। এবং তাদের কর্মকর্তারা এ অঞ্চল কিছুতেই ছাড়বে না।'

মোটকথা, কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে তারা বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, তালেবানরা যেন কিছুই করতে পারেনি। 'যরবে মুমিন' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, এই ঘটনার কয়েক মাস আগে জাতিসংঘের এক ঊর্ধ্বতন অফিসার আমিরুল মুমিনীনের কাছে একটি আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলে আমীরুল মুমিনীন প্রহরীদের বলেন, মাযার ও কাবুলের ঘটনা দুটিতে তাদের কুমতলবের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে এখান থেকে বের করে দাও।

কৃষিমন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ

১২. তালেবান সরকারের কৃষি মন্ত্রনালয়ের প্রধান দায়িত্বশীল বলেন, জাতিসংঘ যে সব চারা বীজ প্রদান করে, তা এমন বিষাক্ত যে, তা শুধু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরই নয়; বরং জমীনের উর্বরশক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ভবিষ্যতে ল্যাবেরটরীতে পরীক্ষা না করে কোন বীজ বা চারা জাতিসংঘ থেকে গ্রহণ করা হবে না।

ইউএনের ষড়যন্ত্র ও কয়েদীদের গণহত্যা

উত্তরাঞ্চলের তালেবান বন্দীদের গণহত্যার ষড়যন্ত্রে জাতিসংঘের যে নগ্ন ভূমিকা ছিল, তা দুনিয়া কখনও ভুলতে পারবে না। আফগানিস্তানকে নিয়ে জাতিসংঘের এসব ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠানটির ইসলাম বিদ্বেষের নমুনামাত্র। যদি সমস্ত চক্রান্ত একত্র করা হয়, তা হলে কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাই এ সংস্থাটির ইসলাম বিদ্বেষের ব্যাপারে বেশি কিছু না বলে এতটুকু বলাই সমীচীন মনে করছি যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ সংস্থাটির ভিত্তিই রাখা হয়েছে ইসলাম বিদ্বেষের উপর। জাতিসংঘের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির

সমস্ত রিপোর্ট ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদী সাক্ষী যে, এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির A থেকে Z পর্যন্ত সবকিছুই কাফেরদের সাজানো।

ইহুদীরা তাদের নিজস্ব সংগঠন 'লিগ অব ন্যাশন্‌স'-এর স্থলে ১৯৪২ সালে আরেকটি সংগঠনের প্রস্তাবনা পেশ করে। তার নাম রাখা হয় 'ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স' বা জাতিসংঘ। ধারাবাহিক তিন বছর আলোচনা ও পরামর্শের পর ১৯৪৫ সালে আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেনের সহায়তায় তারা এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। বাস্তবে এটা ইহুদীদের একটি পরিকল্পিত ফাঁদ। এতে ব্যাপকভাবে অন্যান্য জাতিকে আর বিশেষভাবে মুসিলম জাতিকে নাচের পুতুল বানানোই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য।

১৯৪৫'র পর হতে ইসলামী দেশগুলো এই ফাঁদে ফাঁসতে থাকে। ইহুদীরা এই সংস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্ত চুষতে থাকে। আসুন, আমরা জাতিসংঘের সূচনা ও এর দায়িত্বশীলদের চিন্তা-চেতনা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ও ইহুদীদের 'সুপারগভর্নমেন্ট' পরিকল্পনা

ইহুদী বড় বড় নেতাদের বিভিন্ন জায়গায় একটি শব্দ পাওয়া যায়। 'সুপার গভর্নমেন্ট'। মেন ৬ষ্ঠ সনদে বলা হয়েছে, আমাদের জন্য আবশ্যক হল সম্ভাব্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সবার সামনে এমন একটি সুপার গভর্নমেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে, যা সন্তুষ্ট চিত্তে আনুগত্য গ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

এক ইহুদী গবেষক এই সনদের পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জাতিসংঘ মূলত সেই 'সুপার গর্ভমেন্টে'র দিকে অগ্রগতির প্রথম ধাপ। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর আরেক ধাপ এগিয়ে জাতিসংঘের ভিত্তি রাখা হয়।

জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে ইহুদী সম্প্রদায়

জাতিসংঘের উপর ইহুদী নিয়ন্ত্রণ কতটুকু, তা অনুমান করা যেতে পারে এভাবে যে, প্রতিষ্ঠানটির দশটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার সর্বোচ্চ ৭৪ টি পদের সবগুলোতেই ইহুদী কর্মকর্তা নিযুক্ত। শুধু নিইইয়র্ক দফতেরর ২২ টি শাখার সবগুলোরই প্রধান ইহুদী। অথচ সবগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এখান থেকেই আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও পলিসিসমূহ নির্ধারণ করা হয়। এমনিভাবে

ইউনেস্কোর প্রধান নয়টি শাখার প্রত্যেকটি ইহুদী অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে। এফএও'র এগারোটি শাখার নিয়ন্ত্রণও ইহুদীদের হাতে। বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফাণ্ড) এরও প্রধান নয়টি শাখার প্রত্যেকটি এমন লোক অধিষ্ঠিত রয়েছে, যাঁরা আন্তর্জাতিক ইহুদী সংগঠনের সদস্য এবং এই সবগুলো শাখাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এসবের মাধ্যমেই ইহুদী নেতারা আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে রাখে। এদের ছাড়াও আরও অগণিত ইহুদী এবং তাদের গোমস্তারা বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে আছে। একটু ভাবুন, যখন এমন বিপুল পরিমাণ ইহুদী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালনার কাজ করছে, তখন সেই সংস্থার কোন পদক্ষেপ মুসলমানদের পক্ষে যেতে পারে কীভাবে?

শুনে আশ্চর্য হবেন যে, দুনিয়ার সব দেশে ইহুদীদের গোপন সংগঠন কর্মতৎপর রয়েছে। অনেক দেশ আছে এমন যে, সেখানে ভিন্ন করে কোন সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। বরং সেখানের রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আগে থেকেই গোপনে ইহুদীরা নিজেদের লোক বসিয়ে রেখেছে। সে সব পদে বসে তারা ইহুদীদের কল্যাণে কাজ করে থাকে। যেমন, দুনিয়ার কলঙ্ক আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ পুরোটাই ইহুদীদের ইশারার গোলাম। সরাসরি ইহুদীরা এর তদারকী করে।

আমীরুল মুমিনীনের ফরমান

এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা সকল পাঠককে আহ্বান কবর, তারা যেন জাতিসংঘকে লক্ষ করে আমীরুল মুমিনীনের প্রদত্ত বিবৃতির মূল অংশটুকু আরেকবার লক্ষ করেন। বিবৃতিটি তার ঈমানী দূরদর্শিতার সাক্ষ্য দেয়। আমীরুল মুমিনীন জাতিসংঘের তিনটি মূলনীতির প্রত্যেকটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে বলেন, এই সংস্থাটি ধারাবাহিক ইসলামের গোড়া কেটে যাচ্ছে। ইউএন মুখরোচক বুলি আওড়ায়; কিন্তু সংস্থাটি বহু মুসলমানকে হয়তো সোজা পথ হতে সরিয়ে দিয়েছে, কিংবা তাদেরকে একেবারে মুরতাদ বানিয়েছে।

নারী অধিকার

আমীরুল মুমিনীন মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জাতিসংঘ 'নারী অধিকার' আর 'নারী স্বাধীনতা'র যে বুলি আওড়াচ্ছে, সে ব্যাপারে

সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এর দ্বারা সংস্থাটির উদ্দেশ্য হল, মুসলিম সমাজে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও ব্যাভিচারের প্রসার ঘটানো। এটা একটা চিরন্তণ বাস্তবতা যে, যখনই কোন মুসলিম রাষ্ট্রে অপকর্ম ও নিলর্জ্জতা ব্যাপক হয়েছে, তখনই তা ধ্বংসের শিকার হয়েছে এবং কাফেরদের অধীনস্ত হয়ে পড়েছে। অশ্লীলতা যে জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও সাহস বলতে কিছুই থাকে না। পুরুষরা মহিলাদের মত ভীরু হয়ে যায়। ফলে কাফেরদের মোকাবেলা করার কোন সাহসই তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। আর এটাই কাফেরদের সবসময়েরে প্রচেষ্টা।

আমীরুল মুমিনীন তার ফরমানে জোর দিয়ে বার বার বলেন, আমরা শুধু কুরআন মানি, জাতিসংঘকে মানি না।

শিক্ষা ব্যাবস্থা

আমীরুল মুমিনীন তাঁর বিবৃতিতে জাতিসংঘের শিক্ষানীতি ও পাঠসূচির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ইউএন যে শিক্ষানীতির ঢোল পেটাচ্ছে এবং মুসলিম দেশগুলোতে তা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছে, ইসলামী শিক্ষার সাথে তার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। ইসলাম ধর্মে শিক্ষা ও ইলমের পবিত্রতা ও আবশ্যকতা বিদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু সেটা ওই শিক্ষা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধ ও কুরআন-সুন্নাহর মর্ম পর্যন্ত পৌছনো যায়। কিন্তু ইউএনপ্রণীত শিক্ষানীতির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রকৃত শিক্ষা ও ইলম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কেননা, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে জাতিসংঘের পাঠসূচি শেষ করে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করেও আজ মুসলমানরা ইসলামের একেবারে প্রাথমিক এবং মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারেও অজ্ঞ থেকে যায়। কাজেই আমরা যাচাই করে দেখতে চাই, জাতিসংঘ আমাদের কাছে কোন ধরণের শিক্ষার প্রবর্তন চায়।

মানবাধিকার

বিবৃতিতে আমীরুল মুমিনীন জাতিসংঘের চটকদার শ্লোগান 'মানবাধিকার' নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ঐশীগ্রন্থ কুরআন মানি। যে কুরআন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই মানবাধিকারের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমরা ওইসব আইন প্রত্যাখ্যান করি, যেগুলো জাতিসংঘের বিকৃত মস্তিষ্ক মানবাধিকারের নামে প্রণয়ন করেছে।

মোল্লা ওমর মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা জাতিসংঘের কুরআন বিরোধী আইগুলোকে তাদের মুখে নিক্ষেপ করুন।

আলেমসমাজ ও দীনবিশারদদের কয়েকটি প্রশ্ন

১. যখন সাব্যস্ত হয় যে, জাতিসংঘ ইহুদীদের পরিকল্পিত সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানটির এ যাবৎকালের ইতিহাস ইসলামের সুস্পষ্ট শত্রুতা দিয়ে ভরপুর, তখনও কি এই কুফরী সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করা বৈধ হবে এবং যে সব মুসলিম দেশ এর সদস্য হয়েছে, তাদের জন্য সদস্যপদ বহাল রাখা বৈধ হবে?

২. যে বা যারা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবে, তাদের বেলায় এ কথাটি কি প্রযোজ্য হবে না যে, তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?

৩. যদি তাদের সদস্য হওয়া বৈধ হয়, তা হলে ইউএনে'র ওইসব ধারার কী হবে, যেগুলো সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক? যেমন ইউএনে'র এক বাজেটে পুরুষ ও নারীকে সমান বলা হয়েছে। কাফের ও মুসলিমের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই। ধর্মযুদ্ধকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামের চিরন্তন বিধান ইকদামী জিহাদের পথ বন্ধ করা হয়েছে। ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রতীক হুদুদ ও কেসাসের যথেচ্ছা সমালোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোকে মানবতা পরিপন্থী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। 'মৌলিক অধিকার' 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' ও 'বাক স্বাধীনতা'র ধুয়া তুলে ইলহাদ ও নাস্তিকতার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। খুলে দেওয়া হয়েছে জীবন ও ধর্ম নিয়ে বিষোদগারের পথ। নারীর অধিকারের ব্যানার লাগিয়ে সব ধরণের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও হারাম যৌনাচারকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

৪. যেসব মুসলিম শাসক এই সংস্থার সাথে ইসলাম বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন বা হচ্ছেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের হুকুম কী? বলুন, এভাবে মুসলমানরা আর কত দিন ইহুদীদের হাতে বলি হতে থাকবে? 'মুমিন আর কাফির কখনও এক নয়' ইসলামের এ মূলনীতিটি কি তা হলে দুনিয়া থেকে তুলে দেওয়া হবে?

আরেকটি সাক্ষাৎকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রসূলুল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস্হাবিহি আজ্মায়ীন।

আস্-সাহাব : আজ আমরা সাক্ষাৎকার নেওয়া জন্য উস্তাদ আহমাদ ফারুকের নিকটে উপস্থিত হয়েছি। উস্তাদ আহমাদ ফারুক হচ্ছেন পাকিস্তানের তানজীম আল-কায়দার দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান। আজ প্রথমবারের মত তানজীম আল-কায়দার কোন নেতার কাছ থেকে উর্দু ভাষায় আস-সাহাবের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। এখানে আগে সাক্ষাৎকারটির প্রথমাংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে আমরা সারা বিশ্বের জিহাদী তৎপরতা ও তার ফারযিয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আলোচনা করব ইন্শা আল্লাহ। সবার আগে আমরা উস্তাদ আহমাদ ফারুকের কাছ থেকে তানজীম আল-কায়দার পরিচিতি জানতে চাইব।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : আল-হামদুলিল্লাহ্ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রসূলুল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস্হাবিহি আজমায়ীন।

পর কথা হল, তানজীম কায়দাতুল জিহাদ, সারা বিশ্বে আল-কায়দা নামে পরিচিত। দুনিয়া থেকে ফিতনাকে নির্মূল করা, আল্লাহ্র কালেমা বুলন্দ করা এবং খিলাফত 'আলা মিনহাজুন নবুয়াতকে ফিরিয়ে আনার জন্য গঠিত হয়। এটি একটি জিহাদের তানজীম, যার আমীর হচ্ছেন শাইখ উসামা বিন লাদেন। মূলত এর পরিচিতি এতটুকুই। তবে আল-কায়দার পরিচয় দেওয়ার আরেকটি ভিন্ন দিক আছে। এখন এটি কেবল একটি তানজীমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, যেখানে কিছু অনুসারী ও সমর্থক থাকে, বরং এটি এখন একটি মানহাজের নাম। যেখানেই কাফেরদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও জিহাদের কথা শোনা যায়, যেখানেই তাগূতের চোখের উপরে চোখ রেখে জওয়াব দেওয়ার কথা শোনা যায় এবং যেখানেই এই উম্মতের মুক্তির পক্ষে ক্বিতালের কথা শোনা যায়, সেখানে একই সাথে আল-কায়দার নাম চলে আসে। কাজেই জিহাদ ও আল-কায়দা এই দু'টি শব্দ এখন একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করলে এটি এখন আর গতানুগতিক কোন তানজীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং উম্মতের পক্ষ থেকে যে কেউই শরয়ী মানহাজ অনুযায়ী ক্বিতাল করে, সে দুনিয়ার যেখানেই

অবস্থান করুক না কেন, অথবা যে নামেই কাজ করুক না কেন, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা তার দলের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে শেষ কথা হচ্ছে যখন আমরা তানজীম নিয়ে আলোচনা করছি, তখন এটি এই যুগের একটি আকস্মিক ঘটনা। কারণ বর্তমান যামানার মুসলমানদের উপর এমনসব শাসক এসে চেপে বসেছে, যারা নিজেরা তো জিহাদের দায়িত্ব পালন করছেই না, উল্টো তারাই জিহাদের পথে প্রথম বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা না হলে এটি শুধু কোন তানজীমের একক দায়িত্ব নয়, বরং পুরো খিলাফতের বা মুসলিম প্রশাসনের দায়িত্ব। এই বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে শুধু এই ফরযকে আদায় করার উদ্দেশ্যেই আমরা তানজীম আকারে একসাথে কাজ করে যাচ্ছি; অন্যথায় আমরা নিজেদেরকে এই উম্মতেরই একটি অংশ মনে করি এবং কোন ব্যাপারেই নিজেদেরকে আলাদা মনে করি না। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ আমাদের পরিচয় দিয়েছেন–

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

তোমরা আল্লাহর জিহাদ করো, ঠিক যেভাবে জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি তোমাদেরকে নির্বাচন করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সঙ্কট আরোপ করেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মের উপর অটল থাকো। তিনিই তোমাদের নাম ইতোপূর্বে মুসলমান রেখেছেন এবং এই কুরআনেও (একই নাম)। যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবমণ্ডলের জন্য। অতএব, তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মনিব। অতিউত্তম মনিব ও অতিউত্তম সাহায্যকারী।[৭]

আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম ও মুসলিম জাতির একটি অংশ এবং এর মুক্তির জন্যই আমরা জিহাদ করে যাচ্ছি।

---

[৭] সুরা হাজ: ৭৮

আস-সাহাব : সাধারণ মানুষকে আল-কায়েদার ব্যাপারে বলতে শোনা যায় যে, এটি শুধু আরব ভিত্তিক একটি তানজীম। তা হলে পাকিস্তানের মানুষ এর সাথে যুক্ত হয় কীভাবে?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : এ ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যাঁরা এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই শহীদ হয়ে গেছেন এবং তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন আরব। এখনও আল-কায়েদার বড় একটি অংশ আরব মুজাহিদ। কিন্তু এটি এর পরিচিতির কোন অংশ নয়, আবার এতে শরীক হওয়ার জন্য কোন শর্তও নয়। এ বিষয়ে আমি আগেই বলেছি যে, এটি হচ্ছে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার নাম। তাই যে বা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আক্বীদার উপর কায়েম থেকে শরয়ী হুকুম মোতাবেক জিহাদের ফারযিয়াত আদায় করে যাচ্ছেন, তিনি এই তানযীমের মধ্যে পরিগণিত। চাই তিনি যে কোন গোত্রের, বংশের অথবা এলাকারই হোন না কেন। ইসলামে আমাদেরকে এখানে কোন পার্থক্য শেখানো হয়নি।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, আলজিরিয়াতেও আল-কায়দা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেও কাজ করে যাচ্ছে তানযীমটি। এছাড়াও যদি আমরা দেখি যে, কেউ আমেরিকায়, ইউরোপে অথবা অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় অথবা বিশ্বের অন্য কোন স্থানে জিহাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তা হলে সেও এই তানযীমের অন্তর্ভুক্ত। এখানে যেকোন জায়গা থেকেই মানুষ শরীক হতে পারে। ঠিক এভাবেই পাকিস্তানের মানুষও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছুই নেই।

আস-সাহাব: এইমাত্র আপনি যাদের কথা উল্লেখ করলেন, তাদের ব্যাপারে জিহাদের পথকেই কেন আপনারা বেছে নিয়েছেন?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক: দেখুন! এটি তো আমাদের মনগড়া কোন সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহর গোলাম ও বান্দা হিসেবে আমরা এই দুনিয়াতে জীবন-যাপন করছি। এটি এমন এক ফরয ইবাদত, যার জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

শুধু আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।[৮]

সুতরাং আল্লাহ্ আমাদেরকে একমাত্র তাঁর এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনইভাবে আমরা একমাত্র আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে থাকি, ঠিক একইভাবে আল্লাহর কালেমাকে কীভাবে সবার উপরে বুলন্দ করা যায় এবং নবুয়তী পন্থায় কিভাবে আবার খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যায়– সে ব্যাপারে শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য।

শরীয়ত থেকেই আমরা জানতে পারি এবং দিক-নির্দেশনা পাই যে, জিহাদের মাধ্যমেই এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব। জিহাদের আহ্কাম শরয়তের বহু জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যেও এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে কেফায়া, আর কোন পরিস্থিতে জিহাদ ফরযে আইন। এর মানে উম্মতের সকল সদস্যের উপর ফরয; কেবল তারা বাদে, যাদের শরয়ী ওজর রয়েছে।

যে পরিস্থিতে আজ আমরা জীবিত আছি এবং যে পরিস্থিতিতে আমরা দুনিয়াতে চোখ খুলেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে, বিগত কয়েক শতক ধরে কাফেররা ইউরোপের এলাকাগুলো আমাদের কাছ থেকে জবর দখল করে নিচ্ছে। এই পরিস্থিতি অবলোকন করেই ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদের ফরযিয়াতের ব্যাপারে আলোচনা করে আসছেন। তাঁরা যেসব পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর আলোকে জিহাদ এখন ফরযে আইন। যেসব পরিস্থিতিতে ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ ফরযে আইন বলে উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে–

১. মুসলমানদের ভূমির এক বিঘতও যদি কাফেররা দখল করে নেয়

২. কোন মুসলিম নারী বা পুরুষকে যদি কাফেররা বন্দী করে

৩. অথবা কোন মুসলিম দেশে শাসক যদি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়, তা হলে তাকে সরানোর জন্য জিহাদ ফরযে আইন হয়ে পড়ে।

---

[৮] সুরা জারিয়াত: ৫৬

আজ আমরা যদি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি, তা হলে শুধু এক দিক থেকে নয়; বরং সব দিক থেকেই পূর্বের চেয়ে অনেক জোড়ালোভাবে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে পড়েছে। আমাদের জিহাদের রাস্তা বেছে নেওয়ার কারণ এটাই যে, এখন জিহাদকে আমরা ফরযে আইন মনে করি। শুধু আমাদের উপরই নয়, বরং পুরো উম্মতের উপরেই জিহাদ এখন ফরযে আইন। কাজেই ফরয দায়িত্ব ও আল্লাহর আদেশ পালন করার করার জন্য আমরা ঘর থেকে বের হয়েছি।

আমি আরও বলতে চাই, যে পরিস্থিতি বর্তমানে এই উম্মতের উপর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে এমন অবমাননাকর পরিস্থিতি এই উম্মতের উপর দিয়ে আগে কখনও অতিবাহিত হয়নি। এখন আমাদের ভূখণ্ড জোড় করে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ একটি সময় ছিল, যখন আমরা সারা দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ শাসন করেছি। আর এখন এমন একটি সময় অতিবাহিত হচ্ছে, যখন সারা দুনিয়ায় এক টুকরো ভূমিও খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালিত হচ্ছে। এক দুইজন নয়; বরং হাজার হাজার মুজাহিদ, দায়ী, আলেম এমনকি আফিয়া সিদ্দীকীর মত বোনেরা পর্যন্ত কাফেরদের কারাগারের মধ্যে বন্দী রয়েছে, যাদেরকে মুক্ত করা আমাদের উপর ফরয।

কাজেই আজ যদি বলি যে, এখন আমরা এমন পরিস্থিতি অতিক্রম করছি, যা পূর্বে কখনও এই উম্মত প্রত্যক্ষ করেনি, তা হলে কথাটি অতিরঞ্জন হবে না।

যেমন, আল্লাহর কিতাবকে একবার-দুইবার নয়; বার বার অবমাননা করা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা আল্লাহ তাআলার পরেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি ও সম্মান করি; অন্যকাউকে নয়; কিন্তু অনবরত তাঁর অবমাননা করা হচ্ছে। এখন এতগুলো বিষয় একত্র হওয়ার পরও যদি আমরা জিহাদের জন্য না দাঁড়াতাম, তা হলে আল্লাহর আযাব আসার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং, এটিই হচ্ছে মৌলিক কারণ আমাদের জিহাদের পথ বেছে নেওয়ার।

আস-সাহাব : দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত কিছু কিছু লোক বলে থাকেন, মুজাহিদরা দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : অবশ্যই না, এটি কিভাবে সম্ভব? আমি এর আগেও বলেছি, আমরা আল্লাহর হুকুমের গোলাম। তিনি আমাদের উপর জিহাদকে ফরয করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করে বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৯]

সুতরাং ইসলামের যত হুকুম রয়েছে, তা জিহাদই হোক অথবা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সবগুলোকেই আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করে থাকি। মুজাহিদদের তো মুসলমানদের থেকে ভিন্ন অন্য কোন আক্বীদা নেই। তবে কথা হচ্ছে যেকোন হুকুম শরীয়ত যেভাবে বর্ণনা করেছে এবং ফুকাহায়ে কেরাম তার যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটা সেভাই রাখা বাঞ্ছনীয়। কাজেই দাওয়াতকে আমরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করি ঠিকই; কিন্তু এ বিষয়টিও জানা থাকা উচিত যে, কিছু কিছু পরিস্থিতি এমন আছে, যখন জিহাদ ফরযে আইন এবং দাওয়াত ফরযে কেফায়া হয়ে যায়।

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে এমনই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, তখন পিতার কাছ থেকে সন্তানের, পাওনাদারের কাছ থেকে দেনাদারের, মনিবের কাছ থেকে গোলামের, এমনকি স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীরও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন এর সাথে অন্য কোন কাজের সংঘর্ষ হলে জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

আমরাও এই একই আক্বীদা পোষণ করি। আমরা দাওয়াতের কাজও করছি। এই যেমন, আপনার সাথে আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ হচ্ছে। আমরা মুজাহিদ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি।

---

[৯] সূরা বাকারা: ২০৮

জিহাদ ও দাওয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তবে যদি কখনও কোন প্রকারের বিরোধ প্রকাশ পায়, তা হলে জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু একটি বিষয় আমরা ঠিক মনে করি না, তা হল দাওয়াতের কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে আজ জিহাদ যে ফরযে আইন, সে কথা ঢাকা পড়ে যায়। দাওয়াত তো আমরা দিয়ে থাকি। মুজাহিদরা যে যেখানেই আছেন, সেখান থেকেই তিনি জিহাদের পাশাপাশি দাওয়াতের কাজও আঞ্জাম দেন।

এ গেল এই প্রসঙ্গের একটি দিক গেল। এই প্রসঙ্গের আরও একটি দিক আছে। সেটা ইমাম সারাখসী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্বিতাল শুধু যুদ্ধ করার জন্য ফরয করা হয়নি; বরং এটি ফরয করা হয়েছে এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য।' সুতরাং খোদ ক্বিতাল দাওয়াতের একটি মাধ্যম।

এরপর তিনি বলেন, 'দাওয়াতের দুটি ধরণ রয়েছে। এক ধরণের দাওয়াত হচ্ছে তলোয়ারের মাধ্যমে। অর্থাৎ ক্বিতাল। আরেক ধরণের দাওয়াত হচ্ছে যবানের মাধ্যমে। অর্থাৎ আমরা যাকে তাবলীগ বলে থাকি।'

যবানের মাধ্যমে দাওয়াত অর্থাৎ তাবলীগ ক্বিতালের চেয়ে সহজতর একটি কাজ। কেননা, ক্বিতাল হচ্ছে এমন একটি আমল, যার দ্বারা নিজের জান ও মালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়। কিন্তু তাবলীগে এমন কোন কাজ করতে হয় না। সুতরাং আমরা এখন দাওয়াতের প্রথম ধরণটি পালন করছি, যা অত্যাধিক কষ্টকর, বিপদজনক এবং অধিক কুরবানীসমৃদ্ধ।

বিষয়টি শুধু বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ক্বিতাল ও তলোয়ারের মধ্যে আল্লাহ্ দাওয়াতের এক আশ্চর্যজনক কার্যকারতা রেখেছেন। ১১ সেপ্টেম্বরের বরকতময় হামলার কথা স্মরণ করে দেখুন, এর পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা ইতোপূর্বের বহু বছরের তাবলীগের মাধ্যমেও সম্ভব হয়নি। কিছু সংখ্যক মুজাহিদের জীবন কুরবানীর ফলে কাফেরদের ভূমিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়া তলে আসার তৈরী হয়।

শায়খ উসামা বিন লাদেন এক আলোচনায় খুব সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন যে, মক্কী সময়ের মধ্যে এমন কিছু উত্তম দায়ী দাওয়াতের কাজ করছিলেন, যাদের মত মানুষ এই আসমান ও যমীন না আগে কখনও

দেখেছিল, না ভবিষ্যতে কখনও দেখবে। অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবী হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সেখানে দীর্ঘ তেরো বছর দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এক শ'য়ের উপরে কয়েক জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এই তেরো বছরে দাওয়াতের কাজ চলতে থাকে মৌখিকভাবে। এরপর অর্থাৎ মাদানী সময়ে যখন জিহাদ ফরয হয়, এবং একসময় মক্কা বিজিত হয়, তখন যারা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল তাদেরকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে আনা হয়। তাদেরকে প্রিয় নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি কেমন ব্যক্তি? তখন সবাই উত্তর দেয়, 'আপনি সম্ভ্রান্ত পিতার সম্ভ্রান্ত সন্তান।'

এ রকম কেন হল? যেই ইসলাম তেরো বছরের মৌখিক দাওয়াতের মাধ্যমে বুঝে আসে নি, এখন তা অল্প সময়ে কিভাবে বুঝে এসে গেল?

বুঝে এসেছে, কারণ, তলোয়ার হক কথা বুঝতে সহায়তা করে। মানুষের নফ্স সব ক্ষেত্রেই শুধু প্রমাণ দেখে দাওয়াত কবুল করার মত নয়। যাদের নফ্স প্রশান্ত, তারা মৌখিক দাওয়াত কবুল করে; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই তার নফসের কামনা-বাসনা, অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা তার উপরে বিজয়ী থাকে। এজন্য হকের পক্ষ থেকে প্রমাণ পেশ করার পরও বিভিন্ন ধরণের অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করে তারা।

এ ধরণের মানুষের জন্যই তলোয়ার ও শক্তি প্রদর্শন করতে হয়। তলোয়ার হাতে নিয়েই তা গর্দানে প্রয়োগ করা শর্ত নয়; তবে শক্তির প্রদর্শন অবশ্যই শর্ত। যখন শক্তি প্রদশন করা হয়, তখন দাম্ভিক ব্যক্তিও খুব সহজে দাওয়াত কবুল করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে আমরা দাওয়াতভিন্ন আর কোন কাজ করছি না। বরং দাওয়াতের পথে যে বাধা-বিপত্তি আছে, সেটা দূর করছি এবং 'দাওয়াহ্ বিল বানান' অর্থাৎ তলোয়ারের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছি।

আস-সাহাব : আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন, আপনাদের শত্রু কারা? অর্থাৎ কাদের বিরুদ্ধে আপনারা জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : বন্ধু ও শত্রুর পরিচয় একজন মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে এক্ষেত্রে ধোঁকা খায়, সারা জীবনই হোঁচট খেতে হয় তাকে। আল্লাহর অশেষ রহমত, তিনি আমাদেরকে এ ধরণের

হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি স্বয়ং আমাদেরকে শত্রু চিনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শত্রু চিনিয়ে দেওয়ার এই ধরণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের জীবনে শত্রু-মিত্র পার্থক্য করতে পারা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

আদম আ.-এর জমীনে অবতরণ করার আগেই আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শত্রুর পরিচয় বাতলে দেন। আদমকে তিনি সাবধান করে বলে দেন, শয়তান তোমার শত্রু। সে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে। তার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। পরে যখন আদম আ. প্রতারিত হন, তখনও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শিখিয়ে দেন যে, মুমিনের বন্ধু ও সাহায্যকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। কুরআনের এক জায়গায় তিনি বলেন–

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীমকে যারা অনুসরণ করেছে, তারা, আর এই নবী ও ঈমানদারগণ ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু।[১০]

আরেক জায়গা জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

আল্লাহর বিপক্ষে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। জালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ হলেন মুত্তাকীদের বন্ধু।[১১]

সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের বন্ধু হচ্ছেন ওই সত্ত্বা, যাঁর উপর আমরা ভরসা করে থাকি। আর আমাদের শত্রু হচ্ছে সে, যাকে শয়তান বলা হয়। এরপর আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তানের চেলা-চামুণ্ডার পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট।[১২]

---

[১০] সূরা আলে ইমরান: ৬৮
[১১] সূরা জাসিয়া: ১৯
[১২] সূরা নিসা: ৪৫

শত্রু কে, আমি তা নিজে নির্ধারণ করতে পারব না। আমার নাফ্স কিংবা অন্য কেউই তা নির্ধারণ করতে পারবে না। এজন্য প্রত্যেক যে মুমিন আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য উচিত আল্লাহ, কুরআন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আমরা যদি আল্লাহ তাআলার প্রত্যাবর্তন করি, তা হলে দেখতে পাবো, তিনি আমাদের শত্রুদের ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, শত্রুদের বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

তুমি সব মানুষের চেয়ে মুসলমানদের শত্রুতায় অধিক প্রবল পাবে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে। বন্ধুত্বের বিচারে তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী পারে তাদেরকে, যারা বলে, আমরা নাসারা। এর কারণ, তাদের মধ্যে রয়েছে পণ্ডিত ও পুরোহিত। আর এজন্য যে, তারা অহঙ্কার করে না।[১৩]

আল্লাহ তাআলা এখানে নাসারাদের তুলনায় ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতাকে অধিক প্রবল সাব্যস্ত করেছেন। এই ইহুদী, মুশরিকরাই প্রধান শত্রু। অনেক ক্ষেত্রে নাসারাসমাজও আমাদের শত্রুতায় অবতীর্ণ হয়। এখন কিতাল চলছে তাদের বিরুদ্ধেই।

এরা হচ্ছে বাহিরের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রহমতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে কিতাল চলচে। এই কিতাল পুরো দমে শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। যেমন, আমেরিকার রণতরী লক্ষ করে হামলা, কেনিয়া ও তানজেনিয়ায় আমেরিকান এ্যাম্বেসি আক্রমণ, একই কায়দায় ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকান ভূমি লক্ষ করে হামলা চালানো হয়। আরও পরে ৭ জুলাই লন্ডনে হামলা করা হয়। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে কিতালের একটি ধারাবাহিকতা, যা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়েছে।

---

[১৩] সূরা মায়েদা: ৮২

এরপর আসে চতুর্থ শত্রুর কথা। তার কথা কুরআনের বহু জায়গায়, বহু হাদীসে এবং পূর্ববর্তী সালাফের রচনাবলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শত্রু হচ্ছে মুরতাদরা। এদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ, পূর্ববর্তী অনেক আলেমই মুরতাদদের বিষয়ে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তাদের শত্রুতাকে ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, মাজমু'আ আল-আনওয়ার রচয়িতা মুরতাদদের বিষয়ে লিখেছেন, মুরতাদ হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের। কারণ, সে ঈমান গ্রহণের পর আবার তা প্রত্যাখ্যান করে।

সুতরাং, বাইরের এই তিন শত্রু আর ভিতরের এক শত্রুর বিরুদ্ধে আজ আমরা ক্বিতালকে চালিয়ে যাচ্ছি। যখন যে শত্রুকে প্রাধান্য দিয়ে ক্বিতাল করতে হয়, আমরা তাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকি।

আস-সাহাব : যখন আফগানিস্তানে মুসলমানরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন আমেরিকা ও মুসলিম জাহানের এক বিশাল অংশ মুজাহিদদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র দিয়ে সহায়তা করছিল; কিন্তু আজ যখন আমেরিকার সাথে মুজাহিদরা লড়ছেন, তখন তারা কোত্থেকে এসব সহযোগিতা পাচ্ছেন? তা ছাড়া এখন কোন্ ধরণের হাতিয়ার দিয়ে তারা মোকাবেলা করছেন?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : সত্যিকার অর্থে, এটি হচ্ছে মিথ্যা প্রপাগান্ডা-সমূহের অন্যতম। দুনিয়ার বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে আমেরিকার মিডিয়াসমূহের মাধ্যমে ছড়ানো হয়। বলা হয়, রাশিয়ার পতন হয়েছে আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে। এই অপপ্রচারটি শুধু এখানেই করা হয়নি; বরং মুজাহিদরা যতগুলো বড় বড় কাজ করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে এই ধরণের কোন মিথ্যা ঢাক পেটানো হয়েছে। হোক ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা, অথবা অন্যকোন সময়ের কথা। তারা এই উম্মতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, মুজাহিদদের দ্বারা এ ধরণের কাজ অসম্ভব। অর্থাৎ এত বড় কাজ করার সামর্থ্য নেই তাদের। যাতে উম্মাতের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং গোলামীর জিঞ্জির ভাঙার সাহস সৃষ্টি হতে না পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা বছরের পর বছর প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছে; কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়।

১৯৭০ সালের শেষ দিকে আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের লড়াই শুরু হয়। তখন থেকে ১৯৮৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার মত কোন দেশ কোন প্রকারের সহযোগিতার জন্যও এগিয়ে আসেনি; এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার আগ্রহও দেখায়নি। সবাই ওই সময় দূরে বসে বসে তামাসা দেখছিল। তারা মনে করছিল, এই সামান্য অস্ত্র, আর সামান্য ক'জন মুজাহিদ দিয়ে রাশিয়ার মত শক্তিশালী বাহিনীর পতন ঘটানো অসম্ভব। জিহাদের এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। আমেরিকা বা অন্য কোন তাগুতের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা আসেনি। ওই সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ মুজাহিদরা আজও এ বিষয়ে সাক্ষী। কেবল মুজাহিদদের কুরবানী, শহীদের রক্ত, আর আল্লাহর নুসরাতের দ্বারাই ওই জিহাদ এগিয়ে চলছিল।

১৯৮৫-৮৬ সালের পর জিহাদ একটি বিশেষ অবস্থানে পৌছে। আমেরিকা এর মধ্যে দাখিল না হলেও আল্লাহর নুসরাত জারি থাকারই কথা ছিল। কিন্তু আমেরিকা এসে উপস্থিত হয়। আমেরিকা আসে তার নিজের স্বার্থের জন্য। প্রথমত আমেরিকা চাইছিল না যে, মুজাহিদদের এই বিজয় যেন এমন কোন পরিস্থিতির মোড় না নেয়, খোদ আমেরিকার জন্য বিপদ হতে পারে। আর দ্বিতীয়ত তখন রাশিয়া ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় শত্রু। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই আমেরিকা রাশিয়ার পতন কামনা করছিল। তারপরও বলা ঠিক হবে না যে, আমেরিকা মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেছিল। শায়খ আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম (রহঃ) ছিলেন আরব মুজাহিদদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ১৯৮৭-৮৮ সালের এক খুতবায় বলেছিলেন।

কাথায় আমেরিকার সাহায্য? লোকেরা বলে থাকে যে, আমেরিকা আমাদেরকে স্টেনগান দিয়েছে। আমরা তো স্টেনগান বাজার থেকে ক্রয় করি। একটি স্টেনগানের দাম ৭০ হাজার টাকা।

ওই যুগে ৭০ হাজার টাকা কোন সাধারণ কোন বিষয় ছিল না। শায়খ আজ্জাম রহ. বলেন, ৭০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করা স্টেনগান, তারা তো আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে না। এটি তো একটি ব্যবসা, যে কারও সাথেই করা যেতে পারে। তা হলে এর মধ্যে তাদের সহযোগিতার বিষয়টি কোথেকে এল?

এছাড়া যদি আরব মুজাহিদীনের কথা বলা হয়, যারা তখন বড় ধরণের অবদান রেখেছিলেন, তাঁরাও আমেরিকার কাছ থেকে কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করেননি। আমেরিকার এই কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যের ছোঁয়া নেই; বরং পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট। এরপরও যদি আমরা ধরে নিই যে, গুটি কয়েক ছোট দল তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিল, তা হলে তারা যদি কাফেরদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার শরীয়তনির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ না করেই নিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তারা ভুল করেছে। এ কারণে ফল খারাপ হয়েছে। জিহাদের বরকত নষ্ট হয়েছে। বিষয়টিও সবাই লক্ষ্য করেছে।

শায়খ আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম রহ. এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ১৯৮৬ সালের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ আফগান ভূমিতে আমেরিকার পা রাখার আগ পর্যন্ত মুজাহিদরা আল্লাহর অগণিত সাহায্য ও মদদ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ৮৬ সালের পর যখন মুজাহিদদের কেউ কেউ আমেরিকার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে শুরু করে, (যদিও বিষয়টি সরাসরি হয়নি; হয়েছে পাকিস্তান অথবা সৌদি সরকারে মাধ্যমে।) তখন থেকেই জিহাদের ভূমি থেকে ধীরে ধীরে বরকত কমে যাওয়া শুরু করে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সব মুজাহিদই এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল; বরং গুটি কয়েক ছোট দল এই কাজটি করেছিল। তখনও এমন অনেক আলেম ও মুজাহিদ ছিলেন, যারা আমেরিকার সামনে হাত বিছিয়ে দেননি। তাদের বংশধররাই আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। শহীদ আবদুল্লাহ এ বিষয়ে পুরো একটি কিতাব লিখেছেন। সেটার নাম, 'আয়াতুর রহমান, ফী জিহাদিল আফগান'। এই কিতাবে তিনি আল্লাহর সাহায্য ও মুজাহিদদের কারামতের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

এ গেল আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের জওয়াব। এখন প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ, আজ আমরা কার সাহায্য নিয়ে জিহাদ করব?

এর উত্তর হচ্ছে গতকাল আমরা যাঁর সায্য নিয়ে জিহাদ করেছি, আজও আমরা তাঁর সাহায্যেই জিহাদ চালিয়ে যাব। আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আমাদের আগেও ভরসা ছিল, এখনও ভরসা আছে। শুধু আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব মুমিনগণ যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে।[১৪]

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই সাহায্য করে এবং মুমিনদের মাধ্যমে তোমার শক্তি যুগিয়েছেন।[১৫]

মুমিনদের সহযোগিতা নিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাব আমরা। আল্লাহর পর আমাদের দ্বিতীয় সাহায্যকারী হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ। তারা আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং আমরাও তাদেরকে ভালোবাসি। তারা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের দুআ ও জান-মালের সহযোগিতা আমাদের এই জিহাদ এখন পর্যন্ত জারি আছে।

আস্-সাহাব : জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বিষয়ে যে সব বিভ্রান্তিমূলক কথা শোনা যায়, তার মধ্যে এটিও একটি যে, রাশিয়ার পতনের পর এই জিহাদের ফলাফল কি অর্জিত হয়েছে? এরপরে মুজাহিদরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ও মুসলমানের মধ্যে খুন-খারাবী করা শুরু করে, তা হলে জিহাদের কী ফল পাওয়া গেল?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : প্রথম কথা হচ্ছে, জিহাদের মধ্যে এই লাভ-লোকসানের কথা আসে কোত্থেকে? আমি আগেই বলেছি, আল্লাহর তরফ থেকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেটা পালন করার জন্যই আমরা জিহাদ করি। নাউজুবিল্লাহ্! আমরা তো বৃটিশ, জার্মান অথবা ফ্রান্সিসদের মত কোন কাফের জাতি নই যে, ক্বিতালকে আমরা রাজনৈতিক বিষয় মনে করব এবং নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিব। আমাদের যখন সুবিধা হবে, তখন জিহাদ করব, আর যখন অসুবিধা হবে, তখন বাদ রাখব। জিহাদ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা একটি হুকুম। যখন নামাজ, রোজা, যাকাত অথবা দাওয়াত ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয় না যে, সুবিধা হলে করো, না হলে ছেড়ে দাও। তা হলে জিহাদের ক্ষেত্রে কেন একথা বলা হয়ে থাকে?

---

[১৪] সূরা তাগাবুন: ১৩
[১৫] সূরা আনফাল: ৬২

জিহাদের জন্য শরীয়তে কিছু আহ্কাম রয়েছে। কিছু পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে জিহাদ করা ফরযে আইন, আর এই পরিস্থিতি না থাকলে জিহাদ করা ফরযে কেফায়া। এটি ফরয একটি দায়িত্ব, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আসুন, আমরা তর্কের খাতিরেই আলোচনা করে দেখি যে, এই জিহাদ থেকে আমাদের কী লাভ হয়েছে? যদিও গত হওয়ার কারণে আলোচনার কোন প্রয়োজন রাখে না। তারপরও তর্কের খাতিরে জবাব দিচ্ছি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের এতটুকু ফায়দাই তো যথেষ্ট যে, এই উম্মাহ্ খিলাফত ব্যবস্থার পতনের পর, এমনকি তার আগেও জিহাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা ছেড়ে দিয়েছিল এই গুরুত্বপূর্ণ ফরযটি। অথচ এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদের উপর অবমাননাকর পরিস্থিতি চাপিয়ে দিবেন। সুতরাং এতটুকু লাভই যথেষ্ট যে, পুরো উম্মতের জন্য একটি ময়দান মিলে গিয়েছিল, যেখানে এসে হাজারো যুবক প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং লক্ষ লক্ষ মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন কুরবানী দেওয়ার সুযোগ পায়। আগুনের এই বিস্ফোরণ পুরো উম্মতকে জাগিয়ে তোলে। আফ্রিকা, আরব ও এশিয়া মহাদেশ বহু মানুষ এসে এই জিহাদে শরীক হয়। অনেক মুজাহিদ আসেন ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে। আল্লাহর ইচ্ছায় এর মাধ্যমে একটি নতুন প্রজন্ম তৈরী হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত সেই জিহাদ থেকে শুরু করে আজ বিভিন্ন ময়দানে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই এই একটি লাভই যথেষ্ট যে, এই ঘুমন্ত উম্মতকে সেই জিহাদ জাগিয়ে তুলেছে।

এখানে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, আমরা ইতিহাসের তারিখ কেন এ পর্যন্ত এনে থামিয়ে দিই যে, রাশিয়ানরা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পর মুজাহিদদের কিছু দলের মধ্যে লড়াই হয়েছে। এটি তো একটি বেইনসাফী যে, আমরা ইতিহাসকে একটি জায়গায় এনে থামিয়ে দিই। ইতিহাসে তো এরপরেও আরও কিছু ঘটেছে। এরপর তালেবানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিলুপ্ত হওয়ার পর নতুন করে আবার আল্লাহর জমীনে খিলাফতব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

তাও একেবারে নববী তরীকায়। এটি সেই জিহাদের বরকত না হলে আর কি হতে পারে। কারা এই তালেবান? এই তালেমান তো তাঁরাই, যাঁরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে।

পরে দেখা গেল, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। তখন এরা নিজেরাই ফরয দায়িত্ব পালনের জন্য মাঠে নামেন। কায়েম করেন ইসলামী ইমারাত। কোন বাধা-বিপত্তি পরোয়া না আল্লাহর জমীনে আবার তাজা করেন আল্লাহর হুকুমত। পুরো দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অবকাঠামো তৈরী করে দেন। কাফেরদের উপর হামলা করার প্রস্তুতি শুরু হয়। এবং সেই হামলার জন্য মারকাজে রূপান্তরিত হয় আফগানিস্তান। এতগুলো ফায়দার মধ্য থেকে যে কোন একটি অর্জন করাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তালেবানদের জিহাদ এই ফায়দাগুলোর সবই অর্জন করেছে।

আস্-সাহাব : এই কথাও বলা হয়ে থাকে যে, পরে আমেরিকা এসে আফগানিস্তানের ইমারতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন যদি মুজাহিদরা আমেরিকাকে নিঃশেষও করে দেয়, তবুও সম্ভাবনা আছে যে, চীন বা ফ্রান্সের মত আরেক পরাশক্তি এসে এবং অত্যাধুনিক টেকনলজি ব্যবহার করে ইসলামিক ইমারাতকে আবারও ধ্বংস করে দিবে। শেষে হয়তো দেখা যাবে, টেকনলজি যাদের উন্নত, যুদ্ধসামগ্রী যাদের বেশি, তারাই বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি অর্জন করতে। এই অর্জন করাটাও তো মুসলমানদের দায়িত্ব। যখন আপনার কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুদ থাকবে, তখন কেউ আপনার দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে সাহস পাবে না। তখন আপনি চিশ্চিন্তে জিহাদ করতে পারবেন– এই কথাগুলো অনেক সময়ই পরিচিত কোন কোন আলেম ও ফকীহের মুখে শোনা যায়। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : যে আয়াতটি আপনি এইমাত্র তেলাওয়াত করেছেন, এর বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মুফাসসিরীন এ বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন তাও দেখার প্রয়োজন আছে। اسْتَطَعْتُم مَا অর্থাৎ 'যতটুকু তোমাদের পক্ষে সম্ভব'। মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে দুটি দিক নিয়ে কথা বলেছেন। এক. কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য যতটুকু প্রস্তুতি তোমাদের পক্ষে সম্ভব, সর্বশক্তি দিয়ে তা অর্জন করো। দুই. যতটুকু শক্তি অর্জন করতে পার, সেটা নিয়েই ময়দানে নেমে পড়ো।

সুতরাং যদি মনে করি যে, কাফেরদের মোকাবেলা করতে হলে তাদের সমপরিমাণ শক্তি থাকতে হবে এবং জিহাদের জন্য এটাই পূর্ব শর্ত বানিয়ে নিই, তা হলে এটি কুরআন-হাদীসের কোন কথা হবে না। কেননা, কুরআন-হাদীসে এর পক্ষে কোন দলিল নেই। আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করা, নাকি কাফেরদের চেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করা? এই বিষয়টি আমাদেরকে আগে পরিষ্কার করতে হবে যে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ীই শক্তি অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার পর যদি পরিস্থিতি মারাত্মক হয়, তা হলে আমাদের কাছে যা আছে, তা নিয়েই ময়দানে নামতে হবে। বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানের সামর্থ্য এতটুকুই ছিলে যে, তাঁরা সর্বমোট ৩১৩ জন সাহাবী ময়দানে নেমে আসতে পেরেছিলেন। গুটি কয়েক তলোয়ার ও হাতে গোণা কয়েকটি সওয়ারী ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। হাতের কাছে লাঠিশোটা যে যা পেয়েছিলেন, তা নিয়েই মাঠে নেমে পড়েছিলেন। তা দিয়েই প্রতিহত করেছিলেন কাফেরদেরকে। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে তারা চেষ্টায় ত্রুটি করেননি। যে ফরয তাঁদের উপর আরোপ করা হয়েছিল, তাঁরা সেটা আদায় করার জন্য ময়দানে নেমে পড়েছিলেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তারা আমাদের জন্য একটি আদর্শ কায়েম করে যান।

ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি খুব সহজে বোঝা যাবে। ধরুন! আপনার ঘরে চোর অথবা ডাকাত প্রবেশ করেছে। এখন আপনি কি তাদেরকে বলবেন যে, ভাই! তোমরা যখন এসেই পরেছো, তখন যা খুশি করে যাও। ঘরের সব মালা-মাল, টাকা-পয়সা সব লুট করে নিয়ে যাও। আমাদের তো এতটুকু সময় দরকার ছিল, যাতে আমরা তোমাদের সমান শক্তি অর্জন করে নিতে পারি। আমাদের শক্তি যেহেতু কম, এজন্য আমরা তোমাদের মোকাবেলা করব না। এখন তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো।

এ ধরণের কথা বিবেকপরিপন্থী। শত্রু যখন কারও উপরে আক্রমণ করে, তখন শুধু মুসলমানই নয়; বরং কাফেররা পর্যন্ত হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা দিয়েই জীবন বাঁচানোর জন্য শত্রুর মোকাবেলায় লিপ্ত হয়। আমরা যদি মানব জাতি বাদে অন্য প্রাণীর দিকেও লক্ষ করি, যেমন, ছোট্ট প্রাণী বিড়াল অথবা মুরগির দিকে যদি লক্ষ করি, তা হলেও দেখতে পাব, প্রাণী দুটির

কোন একটিকে যদি কোথাও আটকে রাখা হয়, তা হলে সে বাঁচার জন্য যতটুকু করা সম্ভব, ততটুকু করত থাকে।

সুতরাং বিষয়টি শুধু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং মানুষের প্রকৃতিও এটাই দাবি করে যে, অনেক সময় শত্রু যখন আক্রমণ করে, তখন প্রস্তুতি নেওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায় না, তখন হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা নিয়েই শত্রুর মোকাবেলায় নামতে হয়। অবশ্য এই সাথে প্রস্তুতিও এগিয়ে নিতে হয়।

এখানে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও উত্তর দেওয়া যায়। এই উত্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা ময়দানের বাইরে থেকে বলছেন যে, শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য নেই, মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু শক্তি প্রয়োজন, সেটা তারা কীভাবে জানেন। দূরে বসে তারা কীভাবে বুঝতে পারবেন। কাফেরদের যতটুকু শক্তি আছে, প্রচারমাধ্যম ও হলিউডের ফিল্মের মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে তার অনেক বেশির কথা জানান দিচ্ছে। মন্তব্যকারীরা যদি কখনও জিহাদের ময়দানে আসত, তা হলে সত্যিকার অর্থে কাফেরদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু, সেটা তারা বুঝতে পারত। বড় বড় ট্যাঙ্ক, রণতরী, জঙ্গি বিমান, আর ড্রোন নিয়ে যে দুশমন উপস্থিত হয়, এগুলো সবই শুধু লোকদেখানো। মানুষকে তারা বোঝাতে চায় যে, তারা বহু শক্তির অধিকারী। এসব অস্ত্র কতটুকু কার্যকর এবং এগুলো ধ্বংস করার জন্য যেসব হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কার্যক্ষমতা কতখানি, ময়দানে না এসে তা উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষ হাসি-তামাশা করে বলে, 'ক্লাশিংকোভ দিয়ে মোকাবেলা করতে যাচ্ছে।' আমরা বলব, হাঁ, অবশ্য, প্রথমে আল্লাহর সাহায্য, তারপর ক্লাশিংকোভের মাধ্যমেই আমরা মোকাবেলা করব। ক্লাশিংকোভ ও এ ধরণের সাধারণ অস্ত্র দিয়েই কাফেরদের মোকাবেলা করা সম্ভব।

রাশিয়ার কথা শুনে ন্যাটো পর্যন্ত কাঁপা শুরু করত এবং তার সাথে যুদ্ধের নাম শুনলে ঘাবড়ে যেত। অথচ ন্যাটোতে পুরো ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ। আমেরিকার প্রাণ প্রায় বের হয়েই গিয়েছিল। এখন বেঁচে থাকলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধ কখনই আর গরম হয়ে ওঠেনি। মুজাহিদরা ছোট ছোট অস্ত্র দিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং আল্লাহর রহমতে তাদের পরাস্ত করেছেন।

সুতরাং ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োজন, আগে সে কথা বুঝতে হবে। তাদের মতই ট্যাঙ্ক, রণতরী, জঙ্গি বিমান এবং অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তবে যদি হাতের নাগালে এসে পড়ে, তা হলে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার। যদি না আসে, তা হলেও রাশিয়াকে যেখাবে ধ্বংস করা হয়েছিল, সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকাকেও ধ্বংস করা সম্ভব।

এখানে আরও একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, কুফরী শক্তি অনেক দিন থেকে মনগড়া একটি শাসনব্যবস্থা সারা দুনিয়া জুড়ে কায়েম করে দিয়েছে। জাতিসংঘও একই সিস্টেমে আমেরিকা এবং ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। আগে এই সিস্টেমটি ধ্বংস করতে হবে। যখন এই সিস্টেম ধ্বংস হয়ে শিকড় থেকে নির্মূল হয়ে যাবে তখন ইসলামিক খিলাফত ব্যবস্থা আবার ফিরে আসতে পারবে। সাধারণ বুদ্ধিরই একটি দাবি যে, এই প্রতিষ্ঠিত সিস্টেম ধ্বংস করার জন্য কিছু শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন আছে। যেমন, আমেরিকা কোটি কোটি ডলার খরচ করে অনেক উঁচু দুটি ইমারত টুইন টাওয়ার বানিয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বরে মুজাহিদরা আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন সেই ইমারত দুটি ধ্বংস করে দেন। একে ধ্বংস করতে মুজাহিদদের কতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল? মাত্র ১৯ জন মুজাহিদের রক্ত। তাঁরা তাদেরই কয়েকটি প্লেনে উঠেছিলেন। সেগুলো ব্যবহার করেই বহুতল ভবনগুলোতে আক্রমণ চালান। এই কাজ করার জন্য কত অর্থ খরচ হয়েছিল এবং কত বড় টেকনোলজির প্রয়োজন হয়েছিল? খুব বেশি হলে প্লেন ভাড়া আর সফরের আনুষঙ্গিক খরচ।

আমেরিকা সামুদ্রিক যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে খুব বড়াই করত। সেটা ধ্বংস করতেও খরচ পড়েছিল সামান্য। কয়েক জন মুজাহিদ একটি ছোট্ট স্পীড বোট নিয়ে সেখানে ফেদায়ী হামলা চালান। এতেই সেটা ধ্বংস হয়ে যায়।

একদিকে বিশাল বড় কোম্পানী বিভিন্ন ধরণের মেশিন দিয়ে একটি নতুন মডেলের ট্যাঙ্ক বানায়, আরেক দিকে একটি প্রেসার কুকারের মধ্যে পাঁচ থেকে দশ কিলো বারুদ ঢেলে দিয়ে একজন সাদা-সিধা আফগানী মুজাহিদ তাদের ট্যাঙ্কের নিচে রেখে আসে। এরপর সেটা তুলা ধূনা হয়ে যায়। যদি আপনি খরচের হিসাব করতে যান, তা হলে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখতে পাবেন। এজন্য যখন কারও অন্তর থেকে কাফেরদের ভয় উঠে যায় এবং সে

ময়দানে এসে বাস্তবতাকে নিজের চোখে দেখে, তখন সে বুঝতে পারে, কাফেরদের ভিত্তি ধ্বংস করার জন্য তত বেশি শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই, যতটুকু দাবি করা হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে সর্বশেষ কথা হচ্ছে, আমরা কবে একথা বলেছি যে, আমরা আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে কাফেরদেরকে নাস্তানাবুদ করব। শক্তি অর্জন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর আরোপিত একটি দায়িত্ব। আমাদের বিজয় অথবা কাফেরদের পরাজয়ের সাথে শক্তি অর্জনের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের বিজয় বা কাফেরদের পরাজয় একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সাহায্যের সাথে সম্পৃক্ত। তা না হলে এক হাজার সশস্ত্র সৈন্যের বিপক্ষে ৩১৩ জন নিরস্ত্র প্রায় সাহাবীর বিজয়প্রাপ্তি কীভাবে সম্ভব? অথচ সাহাবদেরই সমৃদ্ধ দল হুনাইনের যুদ্ধে প্রথম দিকে পরাজিত হন। তাদের মনের ভিতরে সামান্য ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আজ তো আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি। যখন ৩১৩ জন নিয়ে আমরা পরাজিত হইনি, তখন আজ পরাজিত হব কেন? আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু জায়গায়। এবং হোনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যধিক্য তোমাদেরকে প্রফুল্ল করেছিল; কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।[১৬]

এক রিওয়ায়াতে এসেছে, এমন একটি মূহূর্ত তখন হয়েছিল যে কিছু সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সবাই পিছনে যেতে শুরু করেছিলেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

---

[১৬] সূরা তওবা: ২৫

বিষয়টিকে আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন, যাতে তোমাদের অন্তর স্বস্তিবোধ করে। সাহায্য তো কেবল পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে।[১৭]

সুতরাং অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বিজয় শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। আল্লাহ তাআলার নিয়ম খুবই আশ্চর্যজনক।

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

ভূপৃষ্ঠে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব, তাদেরকে নেতা করব এবং তাদেরকে বানাব উত্তরাধিকারী।[১৮]

আস্-সাহাব : মুজাহিদদের ব্যাপারে অনেক দীনদার লোকই বলে থাকেন যে, ইমারাতে আফগানিস্তানে যদিও সারা দুনিয়ার মুজাহিদদের আশ্রয়ের জায়গা পাওয়া গিয়েছিল এবং পাওয়া গিয়েছিল প্রস্তুতি গ্রহণের মারকাজ, কিন্তু এমন এক সময়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া হয়, যখন মুজাহিদদের তেমন কোন প্রস্তুতি ছিল না। সুতরাং ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় যে আক্রমণ করা হয়, তা সময়ের আগেই করা হয় এবং এর মাধ্যমে আমেরিকাকে অপ্রস্তুত দুশমনের ময়দানে যুদ্ধে নামার জন্য উসকে দেওয়া হয়।

এই মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, তালেবানদের এই অতিউৎসাহের কারণেই আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারাত ধ্বংস হয়।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : দেখুন! এই ধরনের মন্তব্য যারা করে থাকেন, তারা মনে হয়, ১১ সেপ্টেম্বরের আগের কথা ভুলে গেছেন। ইহুদীরা কি ফিলিস্তিনে ১১ সেপ্টেম্বরের পর ঢুকে ছিল? ভারত কি কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল ১১ সেপ্টেম্বরের পরে? মুসলমানদেরকে গোলাম বানানোর জন্য আমেরিকা সারা দুনিয়াব্যাপী যে মনগড়া শাসন ব্যবস্থা চাপিয়েছে, তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পর? আমেরিকা সোমালিয়ার মুসলমানদের উপরে যে হামলা চালিয়ে ছিল, তা কি ১১ সেপ্টেম্বরের পরের ঘটনা? বসনিয়াতে মুসলমানদের সাথে যে নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়েছিল, দেশটির একেকটি শহরে

---

[১৭] সূরা আলে ইমরান: ১২৬

[১৮] সূরা কাসাস: ৫

হাজার হাজার মুসলমানকে জবাই করা হয়েছিল, পুরো ইউরোপ তখন তামাশা দেখছিল, তাও কি ছিল ১১ সেপ্টেম্বরের পরে?

প্রকৃতপক্ষে এই মন্তব্যটি অর্থহীন। কারণ, আমরা যদি বসেও থাকতাম, তা হলেও কুফরী শক্তিগুলো বসে থাকত না। সুতরাং আমেরিকার উপর হামলা সঠিক সময়েই হয়েছিল। এই হামলার পর থেকে সারা দুনিয়া দুটি প্লাটফর্মে বিভক্ত হয়ে যায়। যদি ১১ সেপ্টেম্বরের আগের সময়ের দিকে আমরা ফিরে তাকাই, তা হলে দেখতে পাব, এই উম্মত দুনিয়ার কোণায় কোণায় তখন অপমান আর মার খাওয়া ছাড়া আর কোন অবস্থানে ছিল না। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা সবকিছুর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তার মানে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকারীরা সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোত এবং প্রবল বেগে তেড়ে আসা বাতাসকে সেই রাতে ঘুরিয়ে দেন। ওই ১৯ জন যুবকের রক্তের মধ্যে আল্লাহ এতটাই বরকত দান করেন যে, বহু দিন যাবৎ অপমান ও জিল্লতির যে লোনা পানি আমাদেরকে পান করানো হচ্ছিল, অনেক দিন পর প্রথম বারের মত সেই নোনা জল পান করার স্বাদ তারা পায়। প্রথম বারের মত স্বদেশেই কাফেরদের গালে এমন চপেটাঘাত পরে যে, তারা কখনও স্বপ্নেও বিষয়টি কল্পনা করেনি। পরেও চপেটাঘাতের ধারা হয়নি। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ৭ জুলাইতে চপেটাঘাত পড়ে মাদ্রিদে। এই কর্মসূচি এখনও অব্যাহত আছে এবং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

উক্ত ঘটনা খিলাফত পতনের পর মুসলিম উম্মাহকে প্রথম বারের মত সাহস যোগায়। ফলে তাদের মনে ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, হাঁ, তাদের এতটুকু সামর্থ্য আছে যে, তারা শত্রুদের চোখে চোখ মিলিয়ে তাকাতে পারে; তাদের গর্দানে হাতও রাখতে পারে। এমন কি তাদের ভূখণ্ডে গিয়ে হামলাও করতে পারে। একইভাবে যে খিলাফত ব্যবস্থা এই উম্মতের হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেটাও তারা জিহাদের মাধ্যমে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে।

১১ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতিকে খারাপ করে দেয়নি; বরং খারাপ পরিস্থিতির উপরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। তা ছাড়া প্রথমবারের মত কাফেরদেরকেও তাদের কর্মের জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়েছে।

এটি ছিল একটি দিক। এর আরেকটি দিক হল, আমেরিকার মত একটি সুরক্ষিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নেই। আমেরিকার মত এত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রকে এভাবেই ধ্বংস করা সম্ভব। এজন্যই সে

নিজের পায়ে হেঁটে আমাদের মুসলিম ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তারা ওখানে বসে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে দালালদের মাধ্যমে আমাদের উপর খড়্গ চালাচ্ছিল।

এই মন্তব্যটি যদি ১১ সেপ্টেম্বরের এক-দেড় বছর পর করা হত, তা হলেও ধরা যেত যে, মন্তব্যটির পিছনে সামান্য হলেই যুক্তি আছে। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের পর আজ আট-নয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন আর এই মন্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই। কারণ, সেই হামলার ফলে মুসলমানদের লাভ বেশি হয়েছে, না কি ক্ষতি বেশি হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই আট-নয় বছরে আমেরিকার কোমর ভেঙে গেছে। আজ সে ইরাক থেকে পালানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে ফেলেছে। আফগানিস্তান থেকে পালানোর জন্য রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশটির কোমর এমনভাবেই ভেঙেছে যে, দেশটি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত এমন শক্ত আঘাত আর কখনও ভোগ করেনি।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমেরিকা এতদিন দুনিয়ার সামনে তার দাজ্জালী চেহারা ঢেকে রাখার জন্য মানবদরদের একটি মুখোশ পরিধান করেছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকেও অনেকে তাদেরকে রাশিয়ানদের চেয়ে ভালো মনে করত। আল্লাহ তাদের চেহারা থেকে সেই মুখোশ আজ সরিয়ে দিয়েছেন। গোয়ান্তানামো বে, আর আবু গারিব কারাগারে যা কিছু ঘটে, তার মাধ্যমেই আমেরিকার আসল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যায়।

১১ সেপ্টেম্বরের ফায়দার কথা বলে শেষ করা যাবে না। এই ঘটনা পর থেকে শুধু আমেরিকাই নয়; বরং পুরো পশ্চিমা বিশ্ব ও ন্যাটো বাহিনীর দিন শেষ হতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ১১ সেপ্টেম্বরের উক্ত ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের আক্বীদার উপর আবার সুদৃঢ় করে দিচ্ছেন। 'আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা' ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাটি প্রায় কয়েক শতক থেকে মুসলিম উম্মাহ ভুলতে বসছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় উম্মতের এই আক্বীদা আবারও সুদৃঢ় হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুই স্তরে বিভক্ত করেছেন– আলেম ও গাইরে আলেম। শাসকগোষ্ঠীও মানুষকে দুই দলে ভাগ করেছে। তাদের এই বিভাজনের কথা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। শেষ যামানায় মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে– একটি দল হবে ঈমানদারদের, যেখানে কোন মুনাফিকীর গন্ধ থাকবে না। আরেক দল মুনাফিকদের, যেখানে ঈমানের কোন গন্ধ থাকবে না।

যার দুটি চোখ আছে, তার কাছে এ বিষয়টি পরিস্কার যে, পুরো দুনিয়া আজ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে কুফরের ইমাম জর্জ বুশের সেই ভাষণ, যেখানে সে বলেছিল, তোমরা হয় আমাদের পক্ষে, না হয় সন্ত্রাসীদের (মুজাহিদদের) পক্ষে। সুতরাং পুরো দুনিয়া এখন দুই দলে বিভক্ত।

এত দিন যাবৎ কুফরের বাহিনী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে এই উম্মতের আক্বীদার মধ্যে যে ভেজাল মিশিয়েছিল, বন্ধু ও শত্রুর পরিচিতি তারা মুছে দিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা ১১ সেপ্টেম্বরের বরকতময় ঘটনার মধ্য দিয়ে সব ভ্রান্ত আক্বীদাকে প্রকাশ করে দেন; জিহাদবিমুখ জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনেন জিহাদ অভিমুখে।

এখন বাকি থাকল ইমারতে ইসলামীর কথা। ইনশা আল্লাহ্ মনে হচ্ছে ইমারতে ইসলামী ফিরে আসতে আর বেশি দিন বাকি নেই। আল্লাহর রহমতে আমরা এখন থেকেই আফগানিস্তানের জুনুবী এলাকাগুলোতে দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে মোল্লা মুহাম্মাদ উমারের পক্ষ থেকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। নিযুক্ত করা হয়েছে কাজীও। তার কাছে জন সাধারণ বিচার-ফায়সালার জন্য যাতায়াত করছে।

আমি বলব, এখন থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার পলায়ন ও ইসলামী ইমারাত কায়েম হওয়া শুরু হয়ে গেছে। যেমন, তাজা খবর হচ্ছে হেলমান্দে দুশমনরা সর্বশক্তি দিয়ে হামলা করা শুরু করেছিল, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই বৃটিশ সেনা বাহিনীর এতটাই ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যেই হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। তারা সামনে আগে বাড়বে, কি বাড়বে না, অথবা তাদের সেনা বাহিনী এখান থেকে প্রত্যাহার করা হবে কি না– কোনটাই তারা স্থির করতে পারছে না। আমরা আশা করি, আফগানিস্তানে অতিসত্বর আগের চেয়ে আরও শক্তি ও বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে ইমারতে ইসলামী আবার ফিরে আসবে, ইনশা আল্লাহ।

আস্-সাহাব: আল্লাহ আপনাকে অনেক উত্তম প্রতিদান দান করুন। আজ আমাদের আলোচনার প্রথম অংশ এখানেই শেষ হচ্ছে। উস্তাদ আহমাদ ফারুকের কাছ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে বিদায়ের অনুমতি চাইব। আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন। আমীন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে আমীরুল মুমিনীনের ভাষণ

আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হযরত আমীরুল মুমিনীন বীরত্ব ও সাহসিকতায় অন্যন্য আফগান জাতিকে লক্ষ করে একটি লিখিত ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন, আজকের এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয়, আজ থেকে আশি বছর আগের কথা। আশি বছর আগে ঠিক এই দিনে ঈমানী চেতনা ও জিহাদী জযবায় উজ্জীবিত হয় আফগান জাতি। সমস্ত তাণ্ডব মাথায় নিয়ে এবং জীবন কুরবানী করে ফিরিয়ে আনে এ দেশের স্বাধীনতা। এই দিনেই বীরত্বের মূর্তপ্রতীক এই জাতি ইসলামে শিক্ষা ও পবিত্র জিহাদের নির্দেশনার আলোকে তৎকালীন জুলুমবাজ সাম্রজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেয়। তখন তারা ছিল রিক্তহস্ত। সামরিক উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র বলতে গেলে কিছুই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্য আর ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে মাত্র দুই মাসে তৎকালীন সুপার পাওয়ারকে লজ্জাস্করভাবে পরাজিত করে। এমন সুপার পাওয়ার, যার দেমাগে সবসময় বিশ্বনেতৃত্ব হাতে নেওয়ার ফিকির গিজগিজ করত। নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং দেশকে আগ্রাসন মুক্ত করার জন্য জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সব গোত্রের পুরুষ-নারী, আবল-বৃদ্ধ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাবই মিলে গড়ে তোলে ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্য গড়ে। এই ঐক্যের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা এই জাতির হাতে ইংরেজ সাম্রজ্যবাদীদেরকে শোচনীভাবে পরাজিত করে দেন।

হে আমার স্বদেশী বন্ধুগণ! আমরা জিহাদী চেতনার অধিকারী বীর পিতৃপুরুষের গর্বিত সন্তান। আমাদের দেশের ধর্মীয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন উৎসর্গের চেতনা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ইংরেজদের চেয়েও অধিক বর্বর ও নির্যাতনপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ইসলামী ভূখণ্ডে কী পরিমাণ নির্যাতন ও পাশবিকতা চালিয়েছে, সে কথা এই জাতি ও সারা বিশ্বের সামনে একেবারে স্পষ্ট। সাথে সাথে দুনিয়া এও দেখেছে যে, সম্বলহীন এই জাতি বাহ্যিক কোন উপকরণ ও সামরিক সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির উপর ভরসা করে ধর্মীয় ও জাতীয় মর্যাদাবোধকে সামনে নিয়ে পিতৃপুরুষদের সোনালী ইতিহাসের সূত্র ধরে সময়ের সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে

জিহাদ ঘোষণা করে। যেই সুপার পাওয়ারের সামরিক শক্তির কারণে আমেরিকাসহ সারা দুনিয়া তটস্থ থাকত।

আলেমদের ফতোয়া শোনার পর পুরো দেশ রাশিয়ান সেনাদের জন্য অগ্নিকুণ্ড বনে যায়। অথচ রশিয়া আধুনিক অস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক বোমাসহ সব ধরণের শক্তি প্রয়োগ করে আফগান ভূমিতে। কিন্তু ঈমানী চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সামনে তারা কিছুই করতে পারে নি। রাশিয়া শুধু আফগান ভূমিতেই পরাজিত হয়নি; বরং পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে যায়। যেই বস্তুতান্ত্রিক শক্তি সারা দুনিয়াকে হজম বা লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে, তারা নিজেরাই আজ ছিন্নভিন্ন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

নিঃসন্দেহে আমরা ঘোষণা দিয়ে বলতে পারি যে, সারা দুনিয়াতে শুধু আফগান জাতিরই এমন ইতিহাস রয়েছে যে, তারা সবচেয়ে বড় জালেম ও প্রতাপশালী দেশকে নাকানী-চুবানী খাইয়ে ছেড়েছে। এটা আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহ।

প্রিয় দেশবাসী! সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের পতনের পর আফগান জাতি আশা করেছিল যে, আফগানিস্তানে একটি মজবুত কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে, যা পরিচালিত হবে ইসলামী শাসনের আলোকে। ষোল লাখ শহীদ ও অসংখ্য এতীম ও বিধবার মনের আরজী ছিল এটাই। কিন্তু আফসোস যে, বহিঃশক্তির অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে আমাদের সে আশা শুধু দূরাশাই থেকে যায়। দেখতে দেখতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আমাদের এ গরীব রাষ্ট্রটি আরেকবার ক্ষমতা ভাগাভাগির সংঘর্ষে জরিত হয়। হাজার হাজার নিরপরাধ জনগণ মারা যায়। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠনসহ সর্বপ্রকার অনাচার ব্যাপক হয়ে পড়ে। জাতি, ভাষা ও আঞ্চলিকতাসহ বহুমুখী বিভাজন ও পারস্পকি বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাধারণ জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরণের মারণাস্ত্র। একটি মাত্র দেশে শত শত সরকার দাঁড়িয়ে যায়।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক শত্রু বিশঙ্খল ও অস্থির পরিস্থিতিকে খুব গনীমত মনে করে। দেশটিকে টুকরো টুকরো করার জন্য এই পরিস্থিতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা হয়। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে দেশের আশির্বাদ মাদরাসাপড়ুয়া ছাত্ররা উলামায়ে কেরামের ফতোয়া ও মুজাহিদ জাতির সমর্থন

নিয়ে কিতাব বন্ধ করে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। মাদরাসা, খানকা ও মসজিদের প্রকোষ্ঠ ছেড়ে ময়দানে নেমে আসে তারা। কুরআনের হাফেজ, তাফসীর ও হাদীসের ছাত্র ও উলামায়ে কেরামের কুরবানীর বদৌলতে দেশের প্রায় ৯৫ ভাগ অঞ্চল আজ জুলুম ও বিশৃঙ্খলা থেকে পবিত্র। নিপীড়িত জনগণ স্বেচ্ছাচার শাসকদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে তালেবানরা এমন কাজ সম্পন্ন করেছে, যার কল্পনা করাও ছিল দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য অপরাধ। বিক্ষিপ্ত শাসনব্যাবস্থা বিলুপ্ত করে সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠন, সাধারণ জনগণকে নিরস্ত্রকরণ এবং দেশকে কয়েকভাগে বিভক্ত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার বিভিন্ন কৃতিত্ব অর্জন করে তালেবানরা।

বর্তমানে ইসলামী ইমারত (তথা তালেবান শাসন) দেশের সমস্ত জাতি ও গোত্রের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী আফগান রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সর্ব প্রকার কুরবানী দিতে প্রস্তুত রয়েছে এই প্রশাসন। ইসলামী ইমারত দুনিয়ার সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, আপনারা আসুন। আফগানিস্তানের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। তারপর ইসলামী ইমারতের সাথে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে ভাবুন। ইসলামী ইমারত ধর্মীয় ও জাতীয় নীতিমালার আলোকে দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আগ্রহী। তবে আমারা কাউকে আমাদের এই নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের অনুমতি দিই না।

আমরা ইসলামী ইমারাতের সুরক্ষা ও স্থায়ী নিরাপত্তার জন্য পুরো মুসলিম উম্মাহর কাছে ইসলামী ইমারাতের সাথে সহায়তামূলকমূলক আচরণ করার আবেদন করছি।

শেষে আরেকবার আমি এ কথার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক মনে করছি যে, আফগান জাতি এই বিংশ শতাব্দীতেই একের পর এক 'ফিরিঙ্গী' ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অত্যন্ত লজ্জাস্কর পরাজয় বরণ করিয়েছে। সারা দুনিয়া আফগান জাতির এই অনুগ্রহের কাছে ঋণী। আফগানিস্তানের জনগণ আজও তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে যে কোন শক্তির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

সুতরাং যারা আজ আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অবৈধ হস্তক্ষেপ করার এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা যেন মনে রাখে, এই জাতির হাতে অস্ত্র না থাকতে পারে, তাদের দেহে কাপড় না থাকতে পারে, কিন্তু সব ধরণের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দাত ভাঙা জওয়াব দেওয়ার জন্য তাদের অন্তর কখনও জিহাদী চেতনা হারাবে না।

সবশেষে গৌরবময় স্বাধীনতা দিবসে সকল শহীদের পবিত্র আত্মার জন্য বিশেষ দোআ করছি। জান্নাতে তাদের সুউচ্চ মাকাম লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করছি।

মুসলিম উম্মাহর প্রতি মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের একটি বার্তা

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আল্লাহর পথে তাদের উপর যত মুসিবত আপতিত হয়েছে, তাতে তারা ভেঙে পড়েনি, দুর্বল হয়নি এবং ক্লান্তও হয়নি। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।

পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ! আপনারা সবাই শুনেছেন এবং একের পর এক দেখছেন যে, যুদ্ধবাজ আমেরিকা আমাদের ভূমিতে কী তাণ্ডব চালাচ্ছে। অত্যাচার, লুণ্ঠন ও নিরাপরাধ মানুষ হত্যাসহ পুরো আফগান জাতির সাথে তারা লাঞ্ছনাকর আচরণ করে যাচ্ছে। তারা আমাদের দেশে প্রবেশ করার অল্প কয় দিনের মধ্যে পুরো দেশে হতাহতের সংখ্যা কল্পনার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দুর্বল শিশু, অবলা নারী আর নিরাপধ লোকদের উপর তারা এমনসব ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্র ও বিষাক্ত বোমা ব্যবহার করছে, যা অন্য সবার জন্য তারা হারাম (অবৈধ) করে রেখেছে। তারা চাইছে ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের সাথে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকর্ম চালিয়ে যেতে। কারণ, তারা মনে করে, দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম দেশে তাদের অবাধ বিচরণের অধিকার রয়েছে।

আমেরিকা কি আজ পর্যন্ত আফগানিস্তানের কল্যাণে কোন কিছু করেছে? বিশ্বনেতৃত্বের তারা দাবিদার। এ দাবির যৌক্তিকতায় কোন কিছুই তারা আজ পর্যন্ত করে দেখাতে পারেনি।

আমেরিকা কি আফগানের দারিদ্র্য মোচন করতে পেরেছে? এ যুদ্ধের মাধ্যমে সারা পৃথিবী দূরে থাক, অন্ততপক্ষে আফগানিস্তানেই কি তারা

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? অথচ নিরাপত্তার ঢাকঢোল পিটিয়েই তো এ অন্যায় যুদ্ধ তারা শুরু করেছিল।

আমেরিকা আমাদের দেশে সব ধরণের বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সন্ত্রাস দমনের নামে লাখ লাখ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। আমেরিকা কি এখন সন্ত্রাস দমনের গ্যারান্টি দিতে পারবে?

যদি সন্ত্রাস দমনের সুকর্মটিই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে তাদের জন্য কি আবশ্যক ছিল না ইহুদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো; ইসরাইল সমর্থন প্রত্যাহার করা। অভিশপ্ত ইহুদী সন্ত্রাসীরা নিরাপরাধ ফিলিস্তিনী জনগণের উপর হত্যা, লুণ্ঠন ও অবৈধ দখলদারত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব কিছুর পেছনে রয়েছে ধোঁকাবাজ আমেরিকার সহায়তা ও সক্রিয় সমর্থন।

আমেরিকার কি কর্তব্য ছিল না, সন্ত্রাসী ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। দেশটি অর্ধশতাব্দী হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এ বুলি যদি সত্যিই হয় তা হলে বার্মার বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুখে তালা কেন?

আসলে আমেরিকার অভিপ্রায় কী, সচেতন মুসলমানরা তা ভালো করেই জানে। তাদের টার্গেট ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করা। যারাই ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তাদেরকেই দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়া। কারণ, তারা ভালো করেই জানে, তাদের ও ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হল ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারী মুসলমান।

আমেরিকা সরাসরি তো একথা বলতে পারে না যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তাই কৌশলে তারা এ যুদ্ধের নাম দিয়েছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'।

আমেরিকা চায় সারা দুনিয়াতে তার নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে। দুর্বল জাতিগুলোর ধন-সম্পদ গ্রাস করতে এবং নিজে পূর্ণ নিরাপদ থাকতে।

আমেরিকা ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান ও আফগান জাতির সাথে যে পাশবিক আচরণ করেছে, তাতে তার ধারণা করেছিল যে, খুব শান্তভাবে তার টার্গেট এখানে বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু আমেরিকার দুর্ভাগ্য যে, মাত্র অল্প সময়েই প্রমাণিত হয়, তাদের এ ধারণা চরম ভুল। তাদের উচিত ছিল পূর্ববর্তী বিভিন্ন দাম্ভিক ও অহঙ্কারী দেশ ও সেগুলোর শাসকদের ইতিহাস

থেকে শিক্ষা নেওয়া। পরাক্রমশালী আল্লাহ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাদের দম্ভ চূর্ণ করেছেন।

আমেরিকা ধারণা করেছিল এ যুদ্ধে বিজয় তারই হবে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা জানি আল্লাহ তাআলা সময়ের বিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তি ইহুদীরা অবাধ্যতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। যেখানে তাদের জন্য অপেক্ষমান ছিল মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্রোধ। ধ্বংস ও অবক্ষয়। তারা নিজেদের দৌরাত্ম্যের মাধ্যমে দ্বারা ডেকে এনেছিল সেই পরিণতি যা বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল তার পূর্ববর্তী অবাধ্যরা।

আল-হামদুলিল্লাহ! আমরা সর্বদা মহান আল্লাহর অঙ্গীকারের উপর রয়েছি। তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। সর্বশেষ উত্তম পরিণাম মুমিনদের জন্যই। পক্ষান্তরে আমেরিকা যেসব হুমকি দিয়ে থাকে, সেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই। আমেরিকা কখনও এগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। ইনশাআল্লাহ।

আমেরিকা ভেবেছিল, তার আশা পূরণ হবে। আফগানসহ সব মুসলিমকে সে গোলাম বানিয়ে ছাড়বে। কারণ, তার কাছে রয়েছে আধুনিক সব সমরাস্ত্র। যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ ও ড্রোন বিমান। আরও আছে পারমানবিক শক্তি। কিন্তু সে জানে না যে, আমাদের কাছে রয়েছে এমন অস্ত্র, যার ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তা হল ঈমানের অস্ত্র। আল্লাহর প্রতি সমর্পনের অস্ত্র। মহান ক্ষমতাধরের উপর ভরসা করার অস্ত্র।

ঈমানের দৌলত বঞ্চিত এই কাফেররা তো মশার চেয়েও অধিক দুর্বল। বাহ্যিক অস্ত্র যতই শক্তিশালী হোক, তা মুমিনের হাতে না হলে তার কোন শক্তিই কার্যকর থাকে না।

বর্তমান বিশ্বেও আমরা দেখতে পাই, এমন অনেক দেশ আছে, যাদের সমরাস্ত্র ও বাহ্যিক শক্তির উপকরণ অনেক বেশি; কিন্তু সেই অস্ত্র তাদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসকরা অসৎ ও স্বেচ্ছাচার। দীন-ধর্মের সাথে গাদ্দারী আর জাতির সাথে শত্রুতা ও চক্রান্তে লিপ্ত।

পক্ষান্তরে আল্লাহর অনুগ্রহে আফগানরা হল ইসলামী দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহাদী জাতি। ধৈর্যের পরাকাষ্টায় উত্তীর্ণ ও ময়দানের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। তারা কখনও নিজেদের ভূমিতে কাফেরদের দখলদারিত্ব মেনে নেয়নি এবং কখনও মেনে

নেবেও না। কোন নির্যাতন মুখ বুজে তারা সহ্য করবে না। রক্তের শেষ বিন্দু খরচ করে হলেও আমেরিকা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মোকাবেলা করে যাবে।

আফগান জাতি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে যে বিশাল শক্তির মোকাবেলা করেছে এবং করে যাচ্ছে, তা শুধু তাদের ঈমানী শক্তির কারণেই সম্ভব হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলার পর তারা মুসলিম জাতির সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সকল মুসলমানের নিকট তাদের কামনা শুধু দোআ আর সমর্থন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আপনাদের সবাইকে তার দীনের খেদমত করার এবং তাঁর মর্জিমাফিক কাজ করার তৌফীক দান করুন। আমাদেরকে শত্রু ও তার মিত্রদের উপর বিজয়ী করুন। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী ও পরাক্রমশালী।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

ইসলাম ও মুসলমানদের সেবক

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ

১৬ ই মুহাররম ১৪২৩ হি.

আমীরুল মুমিনীনকে হত্যার ষড়যন্ত্র

কান্দাহারে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে গুপ্তভাবে হত্যা করার জন্য আন্তর্জাতিক চক্র চেষ্টা করে। কান্দাহারের নির্ভরযোগ্য সংবাদ-মাধ্যমগুলোতে বলা হয়, কান্দাহারের গভর্নর হাউজ এবং আমীরুল মুমিনীনের আবাসগৃহের মাঝপথে সরকারী অতিথিভবনের একেবারে সন্নিকটে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের সামান্য সময় আগে আমীরুল মুমিনীন অতিথি ভবনের পাশ দিয়ে তাঁর বাসভবনে পৌঁছেন। এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ থেকে আমীরুল মুমিনীন তো পূর্ণ নিরাপদ থাকেন। কিন্তু তার রক্ষীবাহিনীর মধ্য হতে ১২ জন শহীদ হন এবং ২০ জন আহত হন।

সংবাদ-মাধ্যমগুলোতে বলা হয় যে, আমীরুল মুমিনীনের ঘরের কাছে দাঁড় করানো সন্দেহজনক বিস্ফোরকভর্তি একটি ট্রাক থেকে এত ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় যে, আশ-পাশের কয়েকটি ভবন ধ্বসে পড়ে। ঘটনাস্থলে একটি বিশাল গর্ত হয়ে যায়। বিস্ফোরণের খবর শুনে চতুর্দিক থেকে মানুষ আমীরুল মুমিনীনের বাসভবনের দিকে ছুটে আসেন। শহরের প্রত্যেক ব্যক্তি আমীরুল

মুমিনীনের অবস্থা জানার জন্য অস্থির পড়েন। যখন তারা জানতে পারেন যে, আমীরুল মুমিনীন সুস্থ আছেন, তখন তারা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন।

এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে কারা ছিল, তা বের করার জন্য স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়সহ ইসলামী ইমারতের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তদন্ত শুরু করে। কান্দাহারের তথ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয় এই হামলার পেছনে কাদের হাত রয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষেই বলা যাবে এর মূল হোতা কে বা কারা। তবে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে বহিঃশক্তির যে হাত রয়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এখানে আশ্চর্যের বিষয় হল, কান্দাহারে রাতে যখন এই বিস্ফোরণ ঘটে, তখন সেখানে আমেরিকান টিভি চ্যানেল সি. এন. এনের কোন সাংবাদিক উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও ঘটনার পরক্ষণেই সিএনএন বিস্ফোরণের সংবাদ প্রচার করে। যদি এতে আমেরিকার কোন হাত না থাকত, তা হলে এত দ্রুত তারা বিস্ফোরণে সংবাদ কিভাবে সম্প্রচার করতে পারে। অথচ সিএনএনের কোন সাংবাদিক কান্দাহারে ছিল না। তা ছাড়া আফগানিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা উন্নত নয় যে, তাৎক্ষণিতভাবে কোন সংবাদ আন্তর্জাতিকক অঙ্গনে সম্প্রচার করা যেতে পারে।

যাই হোক, এই রহস্য বেশি দিন গোপন থাকবে না। আসল অপরাধীদের মুখোশ অবশ্যই উন্মোচিত হবে। এরপর সবাই জানতে পারবে যে, ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত শত্রু কে?

বাস্তব কথা হল, বিগত দিনগুলোতে আমেরিকা আফগানিস্তানের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের হুমকি আমেরিকাকে তার ঘৃণিত ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা থেকে সাময়িক বিরত রাখে। বোমা বিস্ফোরনের পিছনে যে আমেরিকার এজেন্টদের হাত ছিল, সেটা একটা সুপ্রমাণিত বিষয়। আমেরিকা চাইল এজেন্টদের মাধ্যমে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তালেবানদেরকে কোণঠাসা করে ফেলতে।

কর্মকর্তাদের নামে আমীরুল মুমিনীনের বার্তা

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম। নাহমাদুহু ...

আমার প্রিয় ছোট ছাত্র ভাই, বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় মুরব্বীরা! আপনারা সবাই অবগত আছেন এবং আল্লাহ তাআলাও সাক্ষী আছেন যে, এই মাদরাসা

পড়ুয়া ছাত্রগুলো আমার নির্দেশ মত শুধু আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম, মর্যাদা, নেতৃত্ব ও রাজত্ব অর্জনের জন্য এই কুরবানী দেইনি।

আমার বন্ধুগণ! বিষয়টি আপনারা ভালো করে বুঝে নিন। আপনারা জানেন যে, তালেবান আন্দোলন রশিয়ান বা আমেরিকান শত্রুকে লক্ষ্য করে গঠে উঠেনি। আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল আমাদেরই স্বজাতি। যারা পোশাক-আশাকে, গঠন প্রকৃতিতে, ভাষা উচ্চারণে আমাদেরই মত। কিন্তু তারা কার্যত ছিল আল্লাহর দীনের শত্রু। মানবতার দুশমন। এ জন্যই আমরা তাদের মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়েছি।

আমরা সকল বিপদ-আপদ শুধু এই জন্যই মাথা পেতে নিয়েছি যে, এখানে আল্লাহর দীন ছিল পরাজিত এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম ছিল অবহেলিত। এই আফগানীদের সাথেই তোমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এতসব কোরবানী দিতে হয়েছে। কারণ এরা ছিল বিশৃঙ্খলাকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সব ধরণের শরীয়ত বিরোধী অপকর্মে তারা লিপ্ত ছিল। তাদেরকে প্রতিহত করে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই আমরা যুবকদের রক্ত উৎসর্গ করেছি।

ভায়েরা আমার! বিষয়গুলো আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। যদি আপনারা নিজেদেরকে মুজাহিদ তালেবান মুসলমান মনে করেন, তা হলে আমি আপনাদের কাছে শুধু একটি আবেদন করব, আপনারা যেখানেই থাকুন আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রতি গুরুত্ব দিন। আপনাদের কেউ পাঁচ সদস্যের আমীর হলেও সে তার অধীনস্ত সব সাথীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক সাথীর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে তাকে, যেন সে কোন ধরণের অপরাধে জড়িয়ে না যায়। মুসলমান হয়ে অপর মুসলিমের উপর জুলুম না করে। খুব ভালো করে বুঝে নিন, যদি এ বিষয়ে আপনাদের থেকে কোন অবহেলা প্রকাশ পায়, তা হলে সে দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আপনাদেরও এমন পরিণতি দেখতে হবে, যা এই কুলাঙ্গার শাসক গোষ্ঠীকে দেখতে হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী এই শাসকদের উপর মাত্র পাঁচজন তালেবানকে এমনভাবে চাপিয়ে দেন যে, এরা তাদের জন্য গায়েবী শাস্তি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা এদের মাধ্যমে তাদের সকল প্রভাব-

প্রতিপত্তি টুকরো টুকরো করে দেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকেও পরীক্ষায় ফেলতে পারেন। তিনি সকলের উপর সমান ক্ষমতা রাখেন। যদি আমাদের থেকেও শরীয়ত বিরোধী কাজ প্রকাশ পায়, যদি আমরাও অপরাধে জড়িয়ে যাই, অথবা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করে শুধু ক্ষমতাকেই নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিই, তা হলে আল্লাহর কসম! তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমাদেরকে তিনি তাদের তুলনায় অধিক লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। তাই আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হল, আপনারা সবাই আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন। বাহ্যিকভাবে আমাদের বিজয় হল, না পরাজয় হল, সেটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজ দুনিয়াতে আল্লাহর দীন বড় নির্যাতিত ও পরাজিত হয়ে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তারাত্মা পেরেশান হয়ে আছে। উম্মতের বেহাল দশায় রহমতের নবীর হৃদয় যে কতটা কষ্ট পাচ্ছে, তা বলার ভাষা নেই। সুতরাং আমার ভাইয়েরা, আপনারা সম্মিলিতভাবে এদিকে নজর দিন।

আপনাদের কেউ কমিশনার, কেউ গভর্নর, কেউ কোন প্রতিষ্ঠান বা পদের দায়িত্বশীল, কেউ বা কোন গ্রুপের কমাণ্ডার অথবা সাধারণ একজন নাগরিক– সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তা হলে একদিন পস্তাতে হবে। সেদিন কোন লাভ হবে না।

আল্লাহর কসম! দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই আমাদের আক্ষেপ করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও তার অধীনস্তদের আমলের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন। যদি আমরা সম্মিলিতভাবে এগুলো করতে পারি, তা হলে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর তাঁর রহমতের ধারা অবারিত করবেন। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে সেই সত্তার শপথ, যার কুদরতী হাতে আমাদের সকলের প্রাণ! আমরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের অতল গহ্বরে পৌঁছে যাব। আমাদের কোন খবরও থাকবে না।

হে মুজাহিদগণ! তোমরা প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এই চিন্তাকে প্রত্যেক মুহূর্তের সাথী বানিয়ে নাও যে, আল্লাহর দীন কিভাবে বিজয়ী হবে। সাথীদের প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর নাও। লক্ষ রাখো আজ তারা কী করছে। কাল তাদের কী কাজ। প্রতিটি সাথীর কাজকর্মের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখো। আমাদের ডেরায় কিছু কুচক্রী লোক প্রবেশে। যারা জেনে

বুঝে অপরাধে জড়াচ্ছে। তাদের টার্গেট হল তালেবানদের দূর্নাম রটানো। যাতে দূরবর্তীদের মাঝে এটা প্রসিদ্ধ হয় যে, তালেবানরা বর্বর জাতি।

মজলুম সম্প্রদায়! আপনাদের কারও অজানা নয় যে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা সারা দুনিয়ার শত্রুতা মাথা পেতে নিয়েছি। আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কারও বিরোধিতা তোয়াক্কা করিনি। এখন কিছু কুচক্রীর অনুপ্রবেশের কারণে যেন আমাদের ইহকাল ও পরকালে লজ্জিত না হতে হয়। তা হলে আমাদের ও পূর্ববর্তীদের পরিণতি হয়ে যাবে অভিন্ন। তখন সমাজের লোকেরা আমাদের মুখে থু থু দিয়ে বলবে, 'দীনের জন্য সারা দুনিয়ার শত্রুতা মাথায় নিয়ে, দীনের নামে তোমরা এ কী করেছ? যদি আজ আপনারা আমার কথার প্রতি কর্ণপাত না করেন, তা হলে আগামীকাল আপনাদের চড়া মূল্য দিতে হবে।

একথাগুলো যদিও আমি অধমের মুখে শুনছেন; কিন্তু এটাই হল আল্লাহর বিধান। কথাগুলো অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। আমলের নিয়তে শুনুন। যদি আমরা এগুলো পালন করে চলতে পারি, তা হলে যুদ্ধের প্রতিটি ময়দানে বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। আজ বিভিন্ন ময়দানে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তা শুধু আমাদের গুনাহের কারণে হচ্ছে।

সবাই সাক্ষী থাকুন, আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছি। আমি আরেকবার শপথ করে বলছি, আল্লাহ কসম! নিজের মর্যাদা, রাজত্ব, বাদশাহী অর্জনের জন্য আমি এতসব কুরবানী করিনি। আল্লাহ সাক্ষী, আমার দায়িত্ব আমি পূর্ণ করেছি। সুতরাং আমাকে এ ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে না, ইনশা আল্লাহ। তারপরও আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাব। উপদেশ দানের মাধ্যমে; প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কুরবানী দিয়ে যাব। আল্লাহ তাআলা আমাকে একটি মাত্র জীবন দিয়েছেন। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, এ জীবনটি আমি শুধু তাঁর পথেই উৎসর্গ করব।

আমি আশা রাখি, আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করবেন না। বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হয় তার আমলের ভিত্তিতে। আমি আমার দায়িত্ব পুরো করে দিয়েছি। যাতে আপনারা বলতে না পারেন, কেন আপনি আমাদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। আমাদের কেনো দিকনির্দেশনা দেননি।

মুসলমানদের জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ। এ জন্য আমি আপনাদেরকে সতর্ক করছি যে, সংশোধনের জন্য একটি উপদেশ বাণীই যথেষ্ট। যদি কেউ প্রকৃত মুসলিম হয়ে থাকে, তা হলে সে যেন মন দিয়ে শোনে। নিয়ত বিশুদ্ধ করে শোনে। যদি গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে তা হলে যেন এখনই তাওবা করে। পুরো জামাত মাত্র একটি কথায় ঠিক হয়ে যেতে পারে।

এটা একটা ভুল মনোভাব যে, অমুক তো ঠিক হচ্ছে না, তাই আমার ঠিক হয়ে লাভ কি? অন্যদের দিয়ে প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই ঠিক নয়। কাল হাশরের ময়দানে কি এমন কিছু বলা সম্ভব হবে যে, আমার অমুক সাথী নেককার ছিল না, তাই আমি নেককার হতে পারিনি। আপনারা যদি নিজেদের আমল পরিশুদ্ধ করার হিম্মত না করেন, অথবা এতে অক্ষম হন, তা হলে এই পাপিষ্ট শাসকদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন। তারা আগের মতই অপরাধ করে যাক। কারণ যদি আপনারা ভালো হতে না পারেন, তা হলে তারা আর আপনারা তো বরাবরই হয়ে গেলেন। তখন আপনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধ হয়ে যাবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের জিহাদ কিভাবে বৈধ হবে। যদি আমরা নিজেদের আমল পরিশুদ্ধ করে প্রত্যেকে নিজের পাহাদার হতে পারি, তা হলে কোন শক্তি আপনাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি আমারা নিজেদের আমলের ব্যাপারে উদাসীন থাকি, তা হলে যে কেউ আমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে। আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবে। আল্লাহ তাআলাও আমাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেবেন।

যদি আমাদের আমল ঠিক হয়ে যায়, তা হলে আমাদের জিহাদ 'জিহাদ' হবে। আমাদের দ্বারা মুসলমানদের কোন হক নষ্ট হবে না। এর বিপরীত হলে আমাদের হাতেই মুসলমানরা জুলুমের শিকার হবে। আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনারা আমার জন্য দোআ করবেন। আমি ও আপনাদের জন্য দোআ করি। মহান আল্লাহ আপনাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী।

আমীরুল মুমিনীন এবং তাঁর সহচরবৃন্দ

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হাফিযাহুল্লাহু পাখতুন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গুল্যাই গোত্রের লোক। আরবী ও ফার্সীর উপর সমন পারদর্শী

তিনি। আধুনিক শিক্ষা অর্জন না করা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের ফিতনা সমুহের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। রাশিয়ান আগ্রাসনের সময় যুদ্ধের ময়দানে তিনি বীরত্ব ও দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

আমীরুল মুমিনীনের এক সাথী বলেন, তিনি খুব অল্প সময়ে আধুনিক অস্ত্র চালনায় এতটা পারদর্শি হয়ে উঠেন যে, অন্য মুজাহিদগণ অবাক হয়ে যান। তার টার্গেট কখনও মিস হয় না। এজন্যই ইংরেজি পত্রিকার এক সাংবাদিক তাকে Crack-marks man নামে অভিহিত করেন।

জিহাদ চলাকালীন সময়ে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন তিনি। রাশিয়ান বাহিনীর ট্যাংক বিধ্বংসে তার অবদান নজিরবিহীন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি চার বার আহত হন। একবার রাশিয়ান বাহিনীর রকেট বিস্ফোরিত হয়ে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

সর্বদা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভাবনা

বড় বড় অনেক ব্যক্তি তার সামনে প্রস্তাব পেশ করেন যে, আমরা আপনাকে একটি আধুনিক কৃত্রিম চোখ লাগিয়ে দেই। আপনি অপরেশনের জন্য প্রস্তুত হোন। কিন্তু মোল্লা ওমর রাজী হননি। তিনি এ জাতীয় সকল প্রস্তাব কৃতজ্ঞতার সাথে এড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি আমার রবের সামনে এ অবস্থায়ই হাজির হতে চাই। আখেরাতের মনযিল বড় কঠিন। মুসলমানরা দুনিয়াতে এসেছে দীন প্রতিষ্ঠা ও আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য। যখন হাশরের ময়দানের ভিড়ে আমাকে আমার রবের সামনে পেশ করা হবে, তখন এই নষ্ট চোখটি আমাকে জিহাদে শরীক থাকার সাক্ষী হবে। এর বিনিময়ে আমি আমার মালিকের দরবারে মাগফিরাত লাভের আশা করি।

অঙ্গ কর্তিত শাসক

এখানে আরেকটি কথা ব্যক্ত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। মোল্লা ওমরের যেমন এক চোখ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সারা দুনিয়া তার দাপটে বিস্মিত হয়। তেমনই তাঁর এক সাথী মোল্লা মুহাম্মাদ হাসানের এক পা না থাকা সত্ত্বেও আপন প্রতাপ দ্বারা সারা আফগানিস্তানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দুনিয়াতে এমন রাষ্ট্র খুব কমই আছে যার শাসকশ্রেণি তালেবানদের মত এমন মাযুর ও অঙ্গহীন। তালেবান সরকারের প্রতিটি পদের প্রধান দায়িত্বশীল

হয়তো পা কাটা, নয়তো হাত কাটা। অথবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ ক্ষতযুক্ত।

মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান কান্দাহারের প্রাদেশিক গভর্নর। রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে তার এক পা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এখন তিনি কাঠের তৈরী কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করেন। চেয়াবে বসা অবস্থায় তার কাঠের পা যখন মেঝেতে জোরে আঘাত করে, তখন বড় ধরনের আওয়াজ হয়। এতে মাঝে মাঝে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থীরা ভয় পেয়ে যায়। মান্যবর এই গভর্নরের জীবন যে কতটা সাদাসিধে, তা অনুমান করার জন্য একটি ঘটনা বলছি। একবার পাকিস্তান থেকে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির কাফেলা কান্দাহার পৌঁছে। তারা গর্ভনর হাউজের গাড়ীতে করে একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন। তারা গাড়ী থেকে দেখতে পান যে, গর্ভনর মোল্লা হাসান বাজারের ভিড় ঠেলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছেন। মেহমানরা গাড়ি থামান। গভর্নরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হয়রত! আপনি এই ভিড়ের মধ্যে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছেন? আপনার জন্য কি গাড়ির ব্যবস্থা নেই?

তিনি হাসি মুখে জবাব দেন, গভর্নর হাউজের গাড়ি মাত্র একটি। সেটাতেই আপনারা চড়ে আছেন। আপনাদের আসার খবর পেয়ে এই গাড়িটি পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই এখন পায়ে হেঁটেই ঘরে যাচ্ছি। তাছাড়া ভিড়ের মধ্যে পায়ে হেঁটে চলতে আমার একটুও সংকোচ লাগে না।

পাকিস্তানী মেহমানরা গভর্নরের এই কথা শুনে নিজেদের আঙুল কাটতে থাকেন। তালেবান সরকারের আইনমন্ত্রী নজরুদ্দীন তুরাবী এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা গাওস– দু'জনই যুদ্ধে একটি করে চোখ হারিয়েছেন। এই ঘটনা ঘটেছিল রাশিয়া বিরোধী জিহাদে। কাবুলের মেয়র আব্দুল মাজীদও জিহাদে তার এক পা ও হাতের দুই আঙুল হারান।

মোল্লা ওমর রাশিয়ার হামলার সময় ইউনুস খালেসের দল 'হিযবে ইসলামী'র অধীনে জিহাদ করেন। রাশিয়ার পলায়নের পর এই দলটিও ক্ষমতার লোভে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে মোল্লা ওমর অনেক ব্যাথা পান। তিনি তার মিলিশিয়া থেকে পৃথক হয়ে যান।

মোল্লা ওমর শরীয়তের প্রতিটি বিধানের ব্যাপারে অত্যন্ত মজবুত। এত বড় বিপ্লব সাধনের পরও কোন দিন নিজের একটি ফটো তোলা তিনি পছন্দ করেননি। তাকওয়ার ব্যাপারে তিনি এতটাই সতর্ক যে, সর্বদা মোটা কাপড়

পরেন। সাধারন আফগানীরা যে খাবার খায়, তিনি তা-ই নিজের জন্য পছন্দ করেন। এই সমতা ও আত্মবিমুখতাই প্রমাণ করে আল্লাহর বান্দাদের সেবার ক্ষেত্রে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান।

আমেরিকা, ইউরোপসহ অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা মোল্লা ওমরের সাক্ষাতের আগ্রহে থাকত। কিন্তু তিনি ভিনদেশী কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন না। তাই এদের সাক্ষাতের বিষয়টি তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত করেন। তিনি এতই সাদাসিধা যে, নতুন কেউ তার সাক্ষাতে এলে অন্য লোকজনের মাঝে মোল্লা ওমর কে, তা নির্ণয় করাই দুষ্কর হয়ে যায়। আত্মমর্যাদার মোহ তার বিন্দুমাত্রও নেই। নিজের জন্য বিশেষ কিছু তিনি কখনও করেন নি। নিম্ন থেকে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করেন বড় আন্তরিকতা ও উৎসাহের সাথে। চেয়ার বা উঁচু কোন আসনে বসা তিনি পছন্দ করেন না। নিঃসংকোচে মেঝেতে বসে যেতে পারেন। কথা খুব কম বলেন। অনর্থক কথা কখনই তার মুখে শুনতে পাওয়া যায় না। কথা বলেন খুব ধীরে ধীরে। অপর পক্ষের কথা খুব ধ্যান দিয়ে শোনেন। সব বিষয় শুরার মজলিসে পেশ করেন। পরামর্শ ছাড়া এক পাও এগোন না। আফগানীদের অন্তর তার ভালবাসায় ভরপুর। মহত্ত্বপূর্ণ কোন উপাধী বা বিশেষণ ছাড়া তার নাম কেউ মুখে নেয় না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও তাকে 'আলীক্বদর মোল্লা ওমর' নামে স্মরণ করে।

আল্লাহ প্রদত্ত এসব মর্যাদার রহস্য হল সেই দীনদারী, যা আজকের শাসকদের মাঝে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। পুলিশ ও সেনা বাহিনীর লাঠি হাকিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা আর জবরদস্তি সংবর্ধনা বাস্তবে কোন সম্মান নয়। মোল্লা ওমরের কখনও এ জাতীয় সম্মান লাভের প্রয়োজন পড়ে না। জনসাধারণ এমনিতেই তার চলার পথে নিজেদের চোখ বিছিয়ে দেয়। এটাই সেই সম্মান যা, আল্লাহ তাআলা আফগান জনগণের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। তার সুমহান চরিত্র ও সৎকর্মের বদৌলতে।

তিনি দিনভর চাটাইয়ের উপর বসে সরকারী কাজকর্ম আন্‌জাম দেন। আর গর্ভনর, কমাণ্ডার, মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের কাছে ছোট ছোট চিঠি পাঠান। যাতে বিভিন্ন নির্দেশ ও উপদেশ লেখা থাকে। তার পাশে একটি সাধারণ বক্স রাখা থাকে। যাতে মুদ্রা ও নোট রাখা হয়। কোন সেনা কমাণ্ডার বা অভাবী

ব্যক্তি এলে সেই বক্স থেকে তাকে কিছু দিয়ে দেন। তার দেহ উঁচু। গায়ের রং লালচে, নূরানী চেহারা জুড়ে ঘন দাড়ি শোভিত।

কান্দাহারের লোকেরা বলে, আমরা কখনও মোল্লা ওমরের নাম শুনিনি। জিহাদের বীরত্বের কারণে তাঁর নামের চর্চা শুরু হয়। শিক্ষা গ্রহণের জন্য এরচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে যে, অসহায় একটি শিশু, গরীব কৃষকের ঘরে যার জন্ম, সময়ের ব্যবধানে সেই শিশুই দুনিয়ার সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শুধু সৎকর্ম ও খোদাভীতির বদৌলতে।

বাস্তবেব এটা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়। কারণ পবিত্র কুরআনে মর্যাদা ও সফলতার ভিত্তি বলা হয়েছে ঈমানের দৃঢ়তা ও চরিত্রের উৎকর্ষকে। যে কেউ মজবুত ঈমান ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী হবে, সাফল্য তাঁকেই হাতছানি দিয়ে ডাকবে।

মোল্লা ওমর ও তালেবানদের অন্তরঙ্গ বন্ধু শায়খ আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন (র.)-কে নিয়ে আজ চর্চা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাপী। আমেরিকা, ব্রিটেন আজ তার ভয়ে কম্পমান। এর কারণ তাঁর সুদৃঢ় ঈমান ও ইস্তেকামাত।

একবার সঙ্গেসীর উপত্যকা থেকে কিছু লোক আসে। তারা অভিযোগ করে যে, তাদের এলাকার এক কমাণ্ডার দুই যুবতী মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের সম্ভ্রমহানী করে। মোল্লা ওমর তৎক্ষনাৎ ৩০ জন তালেবান সেনা সাথে নিয়ে সেই কমাণ্ডারের ক্যাম্পের উপর হামলা করেন। অপহৃত যুবতীদের উদ্ধার করেন। এবং সেই কুলাঙ্গার কমাণ্ডারকে কামানের সাথে বেঁধে ফাঁসিতে ঝুলান।

বাদশাহ আহমাদ শাহ আবদালীর যুগ থেকে কান্দাহারের একটি প্রাচীন সুরম্য মসজিদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি জুব্বা সংরক্ষিত ছিল। সেটি ছিল একটি মজবুত সিন্ধুকের মধ্যে আটকানো। মোল্লা ওমর সিন্ধুকটি খুলে জুব্বা মোবারক বের করেন। তাতে চুমু খান। চোখে মুখে লাগান। এভাবে আত্মিক শক্তি অর্জন করেন। কান্দাহারের লোকজনকে সেই জুব্বা মুবারক দেখিয়ে ধন্য করেন। আফগান বাসীদের জীবনে এই জুব্বা দেখার চেয়ে অধিক মূল্যবান কোন অর্জন আর ছিল না।

মোল্লা ওমর যেকোন ব্যক্তিকে নির্দ্বিধায় সহায়তা করেন। কারও কাছে কোন অনুগ্রহের বদলা চান না। যেকেউ তার খেদমতে কোন হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন না। শুধু এতটুকু বলেন, প্রিয় ভাই! তুমি যদি হাদিয়া

দিয়ে আমায় খুশি করতে চাও, তবে আমার সাথে মিলে যাও। এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে আমাকে সাহায্য করো।

অক্লান্ত পথিক আর দূর্গম পথ যাত্রা

মোল্লা ওমর জুলুমের পরিসমাপ্তি ঘটান। মাজলুমের অন্তরে স্বস্তি ফিরিয়ে আনেন। সর্বত্র ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এত কিছু করেও কোন এশতেহার প্রকাশ করেননি। কোন সেমিনার করেন নি। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কাউকে জানান দেন নি। তার সামনে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি জানতেন ভালো কাজরে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ।

তিনি নিজের জন্য একটি সাদা পতাকা বানান। তাতে কালিমা তাইয়েবা লেখেন। সঙ্গে নেন কয়েক জন মাদরসাছাত্র। এদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন গ্রামে গঞ্জে। জুলুম, নিপীড়ন, হত্যা ও লুটতরাজের বিরুদ্ধে লোকজনকে সোচ্চার করতে থাকেন। উৎসাহ দিতে থাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি নতুন জিহাদের। আর এ আহ্বানই যেন ছিল ভাগ্যাহত ও নিপীড়িত আফগানীদের হৃদয়ের ভাষা।

আপামর জনতা মোল্লা ওমরের পদক্ষেপ সানন্দে গ্রহণ করে এবং তার হাতে হাত মিলিয়ে শুরু করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ।

কান্দাহার বিজয়

মোল্লা ওমরের সদ্য ঘঠিত দলটি যখন কিছুটা মজবুত হয়, তখন সবার আগে তিনি কান্দাহার জয় করার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময় কান্দাহারে চলছিল মুজাহিদ মিলিশিয়ার কমাণ্ডার নকীব আখুন্দযাদার শাসন।

তার অধীনে ছিল আড়াই হাজার সৈন্য, ১২০ টি ট্যাংক। ছয়টি যুদ্ধ বিমান ও ছয়টি হেলিকপ্টার। এমন একটি সুসংহত বাহিনীর সামনে অল্প ক'জন প্রশিক্ষণহীন মাদরাসাছাত্র কী আর গুরুত্ব রাখে। নকীব চাইলে এই ক'জন ছাত্রকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু উপরওয়ালার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তিনি নকীব ও তার বাহিনীর দিল ঘুরিয়ে দেন। তারা রব্বানীর আনুগত্য ছেড়ে তালেবানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কিন্তু মানছুর নামের আরেকজন স্থানীয় কমাণ্ডার তালেবানের উপর হামলা করে বসে। তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তালেবানকে বিজয় দান করেন এবং কান্দাহারে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।

নকীব আখুন্দযাদার আড়াই হাজার সেনা তালেবানদের সাথে জোটবদ্ধ হয়। কান্দাহার বিজয়ের পর আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের ২০ হাজার ছাত্র মোল্লা ওমরের বাহিনীতে শামিল হয়। এটা ছিল প্রথম দিকের কথা। এর পর থেকে তালেবানের জন্য বিজয়ের দ্বার খুলতে থাকে। যেখানেই তাদের পা পড়ে, সেখানেই তারা সফল হয়। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, তাদের মোকাবেলায় যেন অসহায়। কান্দাহার বিজয়ের পর 'হেরাতের' পথ ধরে তালেবানরা সামনে বাড়তে থাকেন। 'যাবিল' এবং 'উরুযগান' প্রদেশ দুটি কোন প্রকার সংঘর্ষ ছাড়া শুধু তালেবানদের উপদেশ ও উৎসাহ দ্বারা বিজিত হয়ে যায়।

মোল্লা ওমর ও তালেবানের এ বিজয় ধ্বনি সারা আফগানিস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহির্বিশ্বেও এ নিয়ে পর্যালোচনা হতে থাকে। ১৯৯৫'র নভেম্বরে হেলমান্দ প্রদেশ তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর গজনী। এমনইভাবে ওর্য়াদাক ও লোগার প্রদেশের গভর্নরগণও তালেবানের আনুগত্য মেনে নেয়।

একটি প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়ে থাকে যে, আফগানিস্তানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান তালেবানকে সহযোগিতা করে দাঁড় করিয়েছে। সৌদি আরবও তাদেরকে দিয়েছে মোটা অংকের অর্থ।

হাঁ, পাকিস্তান তালেবানকে সহযোগিতা করেছে, তবে তা আর্থিক নয়; বরং চারিত্রিক। তারা তালেবানের মনোবল চাঙ্গা করে রাখে। তাদের সাথে কোন বিষয়ে গাদ্দারী করেনি। আর সৌদি আরবও অর্থ দিয়ে কিছু সহায়তা করেছে। তবে তা অনেক পরে। প্রাথমিক স্তরে তালেবানরা কারও কাছে সহযোগিতা কামনাও করেনি, কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়েও আসেনি। প্রথমে তো তাদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা যে এলাকায় যেত তার পুরোটাই তাদের আনুগত্য স্বীকার করত। হয়তো স্বেচ্ছায়; নয়তো বাধ্য হয়ে। বিজিত এলাকার সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ– সবই চলে আসত তালেবানের কব্জায়।

এভাবেই সংগঠিত একটি ছাত্রদল আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সেনাদলে পরিণত হয়। সূচনা থেকে শুরু করে কোন স্তরেই বহিঃশক্তির কারও কাছে হাত পাতার প্রয়োজন পড়েনি তাদের।

যখন ধারাবাহিকভাবে এলাকার পর এলাকা জয় হতে থাকে, তখন মোল্লা ওমর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য 'সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' খুলে দেন। এক্ষেত্রে

আফগানিস্তানের সমস্ত নাগরিককে সমান সাব্যস্ত করা হয়। কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। এমনকি রাশিয়ানদের পালায়নের পর অবশিষ্ট যেসব কমিউনিষ্ট ছিল, তাদেরকেও মোল্লা ক্ষমা করে দেন। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে যেসব মুজাহিদ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। কিছু কমিউনিষ্ট জেনারেল এমনও ছিলেন, যারা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও সমর-কৌশলে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাশিয়ান সেনাদের কাছে উন্নত প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তারা। মোল্লা ওমরের কাছে হাতিয়ার জমা দিয়ে তারাও আনুগত্য প্রকাশ করেন। মোল্লা ওমর তাদের সন্ধির মনোভাব দেখে অনুপ্রাণিত হন।

তালেবান আন্দোলন খুব অল্প সময়ে চারদিকে অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও অভাবনীয় গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। তারা যেদিকেই গমন করে, লোকজন তাদেরকে সংবর্ধনা দিতে থাকে। শহরের পর শহর আনুগত্য গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালে তারা বিজিত অঞ্চলগুলো সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করার প্রতি মনোযোগ দেয়। সেখানকার সন্ত্রাসী বাহিনী, ডাকাত দল এবং সমাজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে, এমন যত গ্রুপ ছিল, তিনি সব উৎখাত করেন। সাধারণ জনগণের হাত থেকে অস্ত্র জমা নেন। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। যখন চারদিকে তাদের শক্তি ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা কাবুল অভিমুখে অভিযান শুরু করেন।

১৯৯৫ সালে খুব অল্প সময়ে কাবুলের নিকটবর্তী শহর 'ময়দান' দখল করেন তালেবানরা। সেখানে ২৫ হাজার সদস্য তালেবানের আনুগত্য স্বীকার করে। ফলে তালেবানরা আরও মজবুত হয়ে ওঠেন। এ শহরে বিভিন্ন মিলিশিয়ার সাথে সম্পৃক্ত যুবকরা ভারী ভারী অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। সেগুলো তালেবানদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

হেকমতিয়ারের পরাজয়

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার তালেবানদেরকে অবুঝ শিশু মনে করতেন। তিনি বলতেন, যদি তালেবানরা গজনীর দিকে পা বাড়ায়, তা হলে তিনি তাদেরকে যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়ে দিবেন। তালেবানরা তার এ হুমকি কানে তোলেননি। গজনীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন তারা। এতে হেকমতিয়ার চতুর্দিক থেকে

হামলা আসতে থাকে। তালেবানরা গজনীর আশ-পাশের অঞ্চলগুলো কব্জা করে একদিন গজনী শহরে হামলা করে বসেন। গুলবুদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসেন। ১৯ জানুয়ারী ১৯৯৫ তালেবান ও হেকমতিয়ারের বাহিনীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ সময় গজনীর প্রখ্যাত গভর্নর ও সর্দার 'ক্বারী বাবা' এসে তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ফলে গজনী শহরও তালেবানদের দখলে চলে আসে।

এ অবস্থা দেখে হেকময়িার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি আশংকা করতে থাকেন, যদি গজনী থেকে আগে বেড়ে তালেবান 'চাহার আসিয়াবে'র দখল নিয়ে নেয়, তা হলে তিনি আর আফগানিস্তানের মাটিতে পা রাখার যায়গা পাবেন না। তাই তিনি নতুন উদ্যমে তালেবানের উপর হামলা করে কিছু এলাকা ছিনিয়ে নেন। কিন্তু তালেবানরা খুব দ্রুতই তার বাহিনীকে এসব এলাকা থেকে হটিয়ে দেয়।

'চাহার আসিয়াব' ছিল হেকমতিয়ারের মজবুত ঘাটি। বলতে গেলে তার ক্ষমতার হেড কোয়াটার। পুরো অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। এজন্য সেখানে অনেক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। অবশেষে জয় হয় তালেবানের। বুরহানুদ্দীন রব্বানী তখন কাবুলে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন হেকমতিয়ারের পরাজয় সংবাদ শুনতে পান, তখন পুরনো শত্রুর পরাজয়ের সংবাদ শুনে খুব খুশি হন।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের শক্তি ও দাপটের চর্চা ছিল সারা আফগানিস্তান জুড়ে। তালেবানের হাতে তার পরাজয় ছিল আফগানীদের দৃষ্টিতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বোরহানুদ্দীন রব্বানী আহমদশাহ মাসউদ ও হেকমতিয়ারের ভয়ে প্রকম্পিত থাকতেন। একদিন কেউ হেকমতিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, পরাজয় বরণের পর এখন তালেবানের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

তিনি কোন রাখঢাক ছাড়া জওয়াব দেন, 'আমার খান্দানের শিশু থেকে নিয়ে বৃদ্ধ সবাই বন্দী হয়েছে। যুদ্ধে আমার বাবা ও ভাই নিহত হয়েছেন। আমাকে অপরাধী প্রমাণ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি শোনানো হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর আমি কোনই পরোয়া করি না। এখন তালেবানের উপর আমার কোন ক্রোধ ও অভিযোগ নেই।'

রাশিয়া বিরোধী বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সমর নৈপুন্যের অধিকারী মুজাহিদ লিডারগণ যখন তালেবানের হাতে হেকমতিয়ারের পরাজয়ের কথা শুনতে পান, তখন তাদের অন্তরে তালেবানের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তালেবানদের নিত্যনতুন বিজয়, বিজিত অঞ্চলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান– এসব বিবরণ শুনে তাদের কলজে শুকিয়ে আসে। এমনকি লোকেরা নিজেদের সন্তানদেরকে পর্যন্ত তালেবানের নামে ভয় দেখাতে থাকেন। কিছু আফগানীর মুখে শোনা যে, জালালাবাদে শিশুদের অবস্থা এমন হয় যে, তারা একে অপরকে ভয় দেখিয়ে বলে, 'এই তোমার চালচলন ঠিক করো, তালেবান আসছে'।

হেকমতিয়ারের পরজয়ের পর কিছু তৎকালীন কয়েকটি সরকারী বাহিনী সেখানে পৌঁছে শূন্য এলাকা কব্জা করার জন্য। তালেবানরা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু তারা তালেবানের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে যায়। তালেবানরাও তাদের উপর হামলা থেকে বিরত থাকেন। সরকারী বাহিনীর লোকজন অধীনস্তদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র তালেবানদের হাতে সোপর্দ করে। তারা এই নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করে। তালেবানরা তাদের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

তালেবানরা নৈতিকতায় বিশ্বাসী এবং সত্যের অনুসারী। সামান্য পরিমাণ অঙ্গীকার ভঙ্গকেও তারা প্রশ্রয় দেয় না। যদিও এতে তাদের বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বুরহানুদ্দীন রব্বানী, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তম এবং অন্যান্য লিডারদের প্রতিশ্রুতি সময়ে সময়ে রূপ বদলাত। যেদিকে গেলে স্বার্থ রক্ষা পাবে, তাদের প্রতিশ্রুতিও সেদিকেই মোড় নিত। যেখানে তারা দেখতেন যে, এখানে ক্ষমতার রশি হাতে নেওয়ার সুযোগ আছে, সেখানেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেন। প্রয়োজনে আপন ভাইয়ের রক্তনদী বহিয়ে দিতেন। কিন্তু তালেবানের আচরণ কারও সাথেই বিমাতাসুলভ নয়; বরং আপন মায়ের চেয়েও অধিক দরদ ও ভালোবাসাসমৃদ্ধ।

হেরাত বিজয়

আফগানিস্তানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হল হেরাত। এটা দেশটির উত্তর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের পরই ইরানের সীমান্ত।

হেরাত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার একটি কারণ হল, কান্দাহার থেকে বের হয়ে যে রাস্তাটি শুরু হয়ে তুর্কমেনিস্তানে গিয়ে মিলেছে। হেরাত অঞ্চলটি এ সড়কের জন্য সুইচ গেইটের ভূমিকা পালন করতে। অধিকন্তু এখানেই ছিল 'শীনডেণ্ডের' বিমান বন্দর। যা সামরিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ।

এই বমান বন্দরটি রাশিয়ানদের দ্বরা। হেরাতের গভর্নর ছিলেন বুরহানুদ্দীন রব্বানীর বিশ্বস্ত লেফটেনেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ ইসমাঈল খান। তালেবানরা জানতে পারে যে, তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, অপরাধপ্রবণ, অবাধ্য লোকগুলো পালিয়ে হেরাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তালেবানরা গর্ভনর ইসমাঈল সাহেবের কাছে আবেদন করেন, তিনি যেন অপরাধীদেরকে হেরাতে আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ না দেন। কিন্তু ইসমাঈল খান তালেবানদের এ আবেদনের প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি। তাই তালেবানরা হেরাত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯৯৫'র ফেব্রুয়ারী মাসে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তারা 'নিমরোজ' ও 'ফারাহ' অঞ্চল কব্জায় নিয়ে নেন।

২৯ এপ্রিল সরকারী বাহিনী তালেবানের উপর হামলা করে। এতে তালেবানের বেশ কিছু ব্যক্তি শহীদ হন। এ সময় তারা 'শীন ডেন্ড' বিমানবন্দর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। এরপর আবার তালেবানরা নিজেদেরকে বিন্যস্ত করেন। এবং ৬ সেপ্টেম্বরে হেরাত আক্রমণ করেন। গভর্নর ইসলামঈল খান তালেবানের ভয়ে পালিয়ে ইরান চলে যান। তালেবানরা হেরাত দখল করে নেন।

যখন তালেবানরা হেরাত দখল করেন, তখন সারা দুনিয়াতে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। মোঘল সম্রাট বাবর বলেছিলেন, সারা দুনিয়ায় যত শহর দেখেছি, তার মধ্যে হেরাত নগরীকে পেয়েছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। এমন মন মাতানো রূপের শহর আমি আরেকটি দেখিনি। যেহেতু ইরান ও তুর্কমেনিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার একমাত্র পন্থা ছিল এই হেরাত শহর, তাই আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান– এমনকি কাবুলে নতুন করে তালেবানের সমালোচনা শুরু হয়। বুরহানুদ্দীন রব্বানী, আহমাদশাহ মাসউদ, হেকমতিয়ারসহ সব বিরোধীদের মনে তালেবানভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ইরান সরকারের পক্ষ হতে এক কঠোর বার্তা উচ্চারণ করে বলা হয়, তালেবান যেন ইরান সীমান্তের কাছেও না আসে।

হেরাত হাতছাড়া হওয়ার পর রব্বানী ও মাসউদ পাকিস্তানের উপর অপাবদ আরোপ করেন যে, তারা তালেবানকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। তাই তাদের ইঙ্গিতে ১৯৯৫'র ৬ সেপ্টেম্বরে কাবুলে পাকিস্তানী দূতাবাসে আগুন লাগানো হয়। এই অমানবিক আচরণে পাকিস্তান খুব মনক্ষুণ্ন হয়। রব্বানী ও মাসউদ বিভিন্ন অনুগ্রহ ও কুরবানীর কথা মুহূর্তে ভুলে যান, যেগুলো বছরের পর বছর পাকিস্তানীরা আফগান মুহাজিরদের জন্য করে আসছিল। আফগান লিডারদের মেহমানদারী ও সম্মান করতে তারা সামান্যও ত্রুটি করেনি। যেই বাহু এতদিন তাদের মুখে লোকমা তুলে দিচ্ছিল, আজ সেই বাহু ভেঙে দিতে তারা একটুও ইতস্তত করলেন না।

১৯৯৫'র অক্টোবর পর্যন্ত তালেবানরা কাবুলে হামলা করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। কান্দাহার থেকে ৪০০ ট্যাংকের বহর কাবুলের কাছাকাছি পৌছে। এই বছর ১১ নভেম্বর তারা কাবুলের উপর রকেট হামলা শুরু করে। এরপর শুরু হয় কাবুলের উপর বিমান হামলা।

কাবুল অভিমুখে অভিযান

১৯৯৫'র ২০ জুন হেকমতিয়ার তালেবানদের বিরুদ্ধে রব্বানীর সাথে জোটবদ্ধ হন। চুক্তি মোতাবেক তাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরে তালেবানরা জালালাবাদ, সারওয়াবী এবং আসাদাবাদ দখল করেন। সারওয়াবী থেকে তারা কাবুলের দিকে অভিযান শুরু করেন। ভয়াবহ যুদ্ধের পর তারা কাবুল বিজয় করেন।

ড. নজীবুল্লাহ যখন কাবুলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তম তাকে সহজে পালিয়ে যাওয়ার পথ বাতলে দেন। তিনি পালিয়ে যেতে সম্মত হন। এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের কাছে নিরাপত্তার দরখাস্ত করেন। নজীবের মধ্যে কিছুটা হঠকারিতা ছিল। আফগান ও রাশিয়ান সেনারা তাকে 'ষাড়' বলে অভিভহিত করত। নিজ পরিবারের লোকদেরকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নিজে মন্দ পরিণতি ভোগ করার জন্য আফগানিস্তানে থেকে যান।

যা হোক, নজীবুল্লাহ তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে যান। আহমাদশাহ মাসউদ পালিয়ে যান। মোল্লা ওমর কাবুলে ব্যাপক ক্ষমার ঘোষণা দেন। তালেবানের

কাবুল বিজয়ের কারণে ভারত, রাশিয়া ও ইরানসহ মধ্য এশিয়ার দেশসমুহে এক ভয়ার্ত নীরবতা ছেয়ে যায়।

১৯৯৭'র ২৪ মে তালেবানরা মাযার শরীফ জয় করেন। এ সময় পাকিস্তান তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু ২৮ মে আহমদশাহ আবার তালেবানের উপর হামলা করেন এবং ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলে।

ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনশ' তালেবান শহীদ হন। তালেবান মাজার শরীফ থেকে পিছু হটে। ১৯৯৮'র আগস্ট মাসে তালেবান পুনরায় মাজার শরীফ দখল করে। এ সময় ১১ ইরানী কূটনৈতিক, এক সাংবাদিক ও হাজারা গোত্রের অনেক লোক নিহত হয়। এতে জাতিসংঘ চেঁচামেচি শুরু করে। তারা প্রচার করে, তালেবান চার হাজার লোক হত্যা করেছে। তখন মোল্লা ওমর এক বিবৃতিতে তালেবানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, মাজার শরীফের এ লড়াইয়ে তালেবান ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আগে-পরে মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার তালেবান শহীদ হয়েছেন।

আমেরিকার ভয়াবহ হামলা

সে সময় ১৭ আগস্ট কেনিয়া ও তানজিনিয়ায় আমেরিকান দূতাবাস বোম্বিং করে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই হামলার দায় উসামা বিন লাদেন রহ.এর উপর চাপায়। তিনি সেসময় আফগানিস্তানে ছিলেন। আমেরিকা বলে, উসামাকে আমাদের হাতে তুলে দাও। কিন্তু মোল্লা ওমর তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমাদের উপর উসামার অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি আমাদের মেহমান। যে কোন মূল্যে আমরা তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

২০ আগস্ট আমেরিকা জালাজাবাদ ও খোস্তে অবস্থিত উসামা বিন লাদেন রহ.-এর ক্যাম্পে বোমা বর্ষণ করে। করাচীর নিকটস্থ সমুদ্র ঘাটি থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করে। ফলে ২১ জন শহীদ হন এবং ত্রিশজন মারাত্মক আহত হন। উসামা রহ. নিরাপদ থাকেন। তালেবান আমেরিকান হামলার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ঘোষণা দেয়, আমরা কোনভাবেই উসামার উপর আঘাত সহ্য করব না।

১৯৯৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তালেবান বামিয়ান প্রদেশ দখল করে। সেখানে শিয়ামতালম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ইরান যারপরনাই অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে।

এরপরে সার্বিকভাবে তালেবানেরই বিজয়ের ইতিহাস। পাঞ্জশীর ও উত্তর আফগানিস্তানের কিছু এলাকা বাদে ৭৫ শতাংশ এলাকায় তালেবানের বিজয় পতাকা উড়তে থাকে। তালেবানের অভিযানে আহমাদশাহ মাসউদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর দুই দিন আগে দুই আরব মুজাহিদ সাংবাদিক পাঞ্জশীরে অবস্থিত আহমাদশাহ মাসউদের বাংলোতে পৌঁছেন। তাদের কাছে আবদুর রব রসূল সাইয়াফের লিখিত একটি চিঠি ছিল। যার কারণে তারা সহজেই আহমাদশাহ মাসউদের নিকট পৌঁছে যান। তারা ক্যামেরা অন করতেই লুকানো বোমা বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। এই আত্মঘাতী হামলায় আহমাদশাহ মাসউদ ঘটনাস্থলে নিহত হন। আরব মুজাহিদদ্বয়ও শহীদ হন। এই আরব মুজাহিদদ্বয় সাইয়াফের বিশেষ শাগরেদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আফগান জিহাদে উত্তর আফগানিস্তানের খোস্তের আলীশের জেলায় সাইয়াফের ট্রেনিং ক্যাম্প 'শাওয়াই'তে প্রশিক্ষণ নিয়ে 'শামশাদ' পাহাড়ে সাইয়াফের সাথেই যুদ্ধ করেছিলেন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগণে হামলা করা হয়। আমেরিকা বরাবরের মত এর দায়ভারও উসামা বিন লাদেন রহ. ও তাঁর হাতে গঠিত আল-কায়েদার উপর চাপাতে থাকে। এবারও তারা উসামা রহ.-কে আমেরিকার কাছে হস্তান্তরের দাবি জানানো হয়। তালেবান সরকার পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়, আমরা উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া উসামা রহ.-কে আমেরিকার হাতে হস্তান্তর করতে পারি না। আমরা আমেরিকার এই অযৌক্তিক দাবিকে প্রত্যাখ্যান করছি।

আমেরিকা এর জবাবে আক্রমণের পথই বেছে নেয়। এটা তাদের মৌলিক স্বভাব বলা যেতে পারে। মানবতার ঠিকাদার সারা বিশ্বেই অমানবিক কর্ম পরিচালনা করে চলছে। জোর যার মুল্লুক তার, এই নীতির উপর যারা চলছে তাদের কথায় আজও বিশ্ব আস্থা রাখার উপযুক্ত মনে করে। এর চেয়ে বোকামী আর কী হতে পারে?

যা হোক ২০০১ সালের ৭ ও ৮ অক্টোবর মধ্যরাতে তীব্র বোমাবর্ষণ শুরু করে আমেরিকা। নির্বিচারে বোমা হামলায় হাজার হাজার নিরপরাধ নারী-শিশুসহ সাধারণ জনগণ জীবন হারায়। আহতদের সংখ্যা ছিল অগণিত। তালেবানের কাছে বিমান হামলা প্রতিরোধের কোন অস্ত্র ছিল না। এ কারণে তারা শহর ছেড়ে আত্ম গোপনে গিয়ে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ২০০১ সালে সারা দেশে তালেবান সরকারের সমাপ্তি ঘটে।

উত্তরাঞ্চলীয় জোট আমেরিকার ছত্র-ছায়ায় কাবুল দখল করে। কাবুল ও মাজার শরীফের অলিগলি পুনরায় নিষ্পাপ শিশুদের রক্তে রঞ্জিত হয়। আমেরিকা ও তার সহযোগী জোটগুলো শক্তির দর্পে জনসম্মুখে পজিশন নেয়। এতদসত্ত্বেও আল-কায়েদা ও তালেবানের বিরুদ্ধে তাদের সকল কার্যক্রম ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। কারজাই সরকার শুধু কাবুলেই সীমাবদ্ধ থাকে। বড়জোড় তাকে কাবুল শহরের মেয়র বলা যেতে পারে। একটি দেশের প্রধান বলাতো দূরের কথা।

তালেবানের যুদ্ধ কৌশল আমেরিককা ও তার সহযোগী জোট বাহিনীকে আফগানিস্তান ত্যাগ করার পথ বন্ধ করে দেয়। আফগানিস্তানের উপর বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ করেও তারা মোল্লা ওমর ও উসামা বিন লাদেনের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হয়।

ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দিন হেকময়িার তালেবান আন্দোলনের শুরু থেকে ক্ষমতা সমাপ্তির শেষ পর্যন্ত বিরোধীতাই করে গেছেন। সে আফগান সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন।

উক্ত বইয়ে তিনি তালেবান সম্পর্কে লেখেন– আফগানিস্তানে বর্বরতা, মূর্খতা, জুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জনজীবন হয়ে পড়েছিল সংকটাপন্ন। তালেবান কান্দাহার ও অন্যান্য এলাকার জিহাদী গ্রুপেরই লোক। জনগণ তালেবানের পক্ষ নেয়। যদি অন্য কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করত, তা হলেও জনগণ তাদের সহায়তা করত।

সাধারণত তালেবান সম্পর্কে বলা হয়, তারা শুধু পশতুন সম্প্রদায়ের লোক। অন্যকোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের কোন লোক তালেবানে নেই। এ জাতীয় কথা বলার উদ্দেশ্য হল, তালেবনাকে সার্থান্বেষী গোত্রপূজারী দল বলে বদনাম রটানো। আসলে তালেবান গোত্রীয় সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করে না। তারা শুধু পশতুন জাতির উন্নতির জন্য কাজ করে, এমন

কথাও প্রচার করা হয়। যখন তাদেরকে বলা হয় তালেবান খুবই ইসলাম প্রিয় এবং শরীয়ত বাস্তবায়নে তারা বদ্ধপরিকর। তখন তারা বলে, মূলত তালেবান নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই ইসলামের নাম ব্যবহার করে।

তালেবানের উপর আরোপিত এমন সব মনগড়া আপত্তির অনেক জবাব রয়েছে। এমন সব বাস্তব প্রমাণ রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটিই এসব অলিক অভিযোগ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। উদাহরণত বলছি– তালেবান আন্দোলনের বড় বড় দায়িত্ব পশতুনদের বাইরের লোকেরা আঞ্জাম দিচ্ছে। তালেবানের বিরোধিতাকারী সকলের কাছেই বিষয়টি প্রসিদ্ধ। এতটুকু বাস্তবতাই তাদের অভিযোগ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। তারপরও আমরা কিছু তথ্য পেশ করব, যা থেকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে যে, তালেবান কোন গোত্রপূজারী দল নয়; বরং এ আন্দোলনের শুরু থেকেই অনেক ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যরা সক্রিয় রয়েছেন।

পিটার মার্সডান লিখেছেন

'বংশগত ভাবে তালেবানের অধিকাংশ সদস্য পশতুন। এতদসত্ত্বেও তাদের বক্তব্য হল, আমাদের আন্দোলনের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। যে কোন গ্রুপ, বংশ বা গোত্রের লোক এতে শরীক হতে পারবে। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, তালেবানের অনেক সদস্য পশতুন জাতির বাইরের লোক। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এরা সকলেই সুন্নী মুসলমান।'

আফগান ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ মুবারিয বলেন

'প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলনটি দাররানী বংশের বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা গুলজাই, পশতুন, পাকিস্তানের পশতুন গোত্রসমূহ, তাজুক, উজবেক, বেলুচ, হাজারা জাত, বদখশানী, নূরিস্তানী ইত্যাদি গোত্রের মাঝে বিস্তার লাভ করে। এবং তারা জাতীয় পর্যায়ের সম্মিলিত আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।'

এ পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে যে, তালেবান বিভিন্ন বক্তৃতা ও ঘোষণার ক্ষেত্রে গোত্রপূজা থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে কথা বলে। তালেবানের কাতারে হাজারা, উজবেক, বদখশানী এবং শিয়াদের উপস্থিতি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এটি একটি জাতীয় এবং সম্মিলিত আন্দোলন।'

উল্লেখ্য যে, উত্তর আফগানিস্তানের দিকে তালেবান অগ্রসর হতেই শিয়া জাতি আন্তরিকভাবেই তালেবান সরকারের আনুগত্য আনুগত্য স্বীকার করে। তাদের অনেক নেতা কান্দাহারে এসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইমারাত ইসলামিয়্যা আফগানিস্তানের অনুগত হওয়ার ঘোষণা দেয়।

তালেবান কোন গোত্রপূজারী দল নয়, তার একটি বড় প্রমাণ হল, তার সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কান্দাহারের অধিবাসী অপশতুন লোক অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আহমাদ রশীদ, 'তালেবান' গ্রন্থে লেখেন--

শূরা সদস্যদের দশজনের মধ্যে ছয়জন দাররানী বংশের, একজন তাজুক মৌলভী সায়্যেদ গিয়াসুদ্দীন। যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পশতুন এলাকায় বসবাস করে আসছেন। ১৯৯৮ সালে কাবুলের ১৭ সদস্য বিশিষ্ট শুরার আটজন ছিলেন দাররানী। পশতুনদের সংখ্য সর্বমোট দশ ছিল। তিন জন ছিলেন গুলজাই আর দুইজন পাঠান গোত্রের। অবশ্য প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা ঢিল দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালে ১১ গভর্নরের মধ্যে মাত্র চারজন ছিলেন কান্দাহারের অধিবাসী। অতীতে গভর্নর নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্মানিত লোকরেদকে বাছাই করা হত। এতে বিভিন্ন বংশের লোকদের প্রতিনিধত্ব হত ঠিকই; কিন্তু নানা সমস্য দেখা দেয়। এরপর তালেবান উক্ত নিয়ম বন্ধ করে দেয়। ভিন্ন অঞ্চলের লোক নির্বাচন করে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৯৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী তালেবান আমীর মোল্লা ওমর এক বার্তায় বলেন, তালেবান আন্দোলন যদিও কান্দাহারের পশতুন এলাকা থেকে শুরু হয়েছে। কিন্ত আমাদের সাথে তুর্কিমান, উজবেক, তাজুক, ফারসী, বান ও পশতু ভাষাভাসী সহ আফগানের সকল সম্প্রদায়ে আলেম ও ছাত্র শরীক আছেন। আমাদের উদ্দেশ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন করা। আর এই উদ্দেশের ক্ষেত্রে তাজুক, উজবেক, পশতুন– কারও মতপার্থক্য নেই। বাইরের কোন শক্তি আমাদেরকে সহায়তা করেনি। আমাদের তা প্রয়োজনও নেই। কেননা, আমাদের জাতি আমাদের সাথে আছে।

কোন আন্দোলনকে বুঝতে হলে তার নেতৃত্ব কারা দিচ্ছেন, তা জানতে হয়। বিশেষ করে সে সব নেতার পরিচয় জানা প্রয়োজন, যারা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তালেবান আন্দোলনের গোড়ার নেতাদের মধ্যে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ, মাওলানা মুহাম্মাদ রাব্বানী রহ., মাওলানা আবদুল

জলীল, মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমানী, মোল্লা দাদুল্লাহ আখুন্দ, মৌলভী মুহাম্মাদ গাউস, মোল্লা আবদুর রাজ্জাক আখুন্দ, মৌলভী এহসানুল্লাহ এহসান শহীদ, মোল্লা বেরাদার আখুন্দ, মোল্লা খাইরুল্লাহ খায়েরখাহ, মৌলভী ওয়াকীল আহমাদ মুতাওয়াক্কিল, মোল্লা মুশীর শহীদ, মোল্লা হাজী মুহাম্মাদ শহীদ, মুফতী মাসূম আফগানী, মোল্লা ইয়ার মুহাম্মাদ শহীদ, মোল্লা আমীর খান মুত্তাকী, মোল্লা বুরজান শহীদ, মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী, মোল্লা কুদরতুল্লাহ জামাল, মৌলবী আবদুল হাই মুতমাইন, মোল্লা আবদুল গনী ইলিয়াস, মোল্লা নাজমুদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

পিটার মার্সডান মোল্লা ওমরের পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে

'তালেবানের শীর্ষ নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর, যাকে আমীরুল মুমিনীন উপাধীতে ডাকা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বোচ্চ ক্ষতাধর কমিটিকে 'শূরা' বলা হয়। যা কান্দাহারে অবস্থিত। এর সভাপতি হলেন মোল্লা ওমর। কাবুলে ছয় সদস্য বিশিষ্ট শূরা কমিটি রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সকল সিদ্ধান্ত ঐক্যমতে গৃহীত হয়। মোল্লা ওমর অত্যন্ত পরহেজগার ও সাদামাটা চলনে অভ্যস্ত ব্যক্তি। বংশগত ভাবে তিনি পশতুন। রাশিয়ান আগ্রসনের সময় তিনি ইউনুস খালেসের হিযবে ইসলামীতে অংশ নেন। তার বয়স ৩৫ এর কাছাকাছি। তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ সামরিক কমাণ্ডার। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি একটি চোখ হারান। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর রহস্যের পর্দা রয়েই গেছে। সরকারী কোন অনুষ্ঠানে তিনি জনসম্মুখে আসেন না। এমনকি বহিঃরাষ্ট্রের কোন মেহমানের সাথে সাক্ষাৎও করতে পছন্দ করেন না। বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান কিংবা জাতিসংঘের কর্মকর্তা বা তার প্রতিনিধির সাথেও সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক নন। সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সমর কৌশল নির্ণয়ে সময় ব্যয় করেন।

আহমাদ রশীদের কলমে মোল্লা ওমরের বিস্তারিত পরিচয়

আজকের বিশ্বে মোল্লা ওমর ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি এমন নেই, যার পিছনে গোয়েন্দাবৃত্তি ও তথ্যসন্ধানের জন্য এত বেশি লোক লেগে আছে। তার বয়স ৩৯ বছর। তিনি কখনও ছবি ওঠাননি। কখনও কোন পাশ্চত্যের রাষ্ট্রদূত কিংবা সাংবাদিককে সাক্ষাৎ দেন নি।

১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের কোন এক প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তালেবান সরকারের বয়স চার বছর। আফগানিস্তান সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি আল আখচার ইব্রাহিমী সম্ভবত এ উদ্দেশ্যে এসেছিলেন যে, ইরান কর্তৃক আফগানিস্তানের উপর ভয়াবহ হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সে সম্পর্কে তালেবানকে কিছু বলা দরকার। মোল্লা ওমর কান্দাহারে বসবাস করেন। তিনি মাত্র দুই বার কাবুলে গেছেন। তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। তার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা আফগান ও বিদেশীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, ২৪ ঘন্টা তারা সে অপেক্ষাই থাকে। ১৯৫৯ সালের কাছাকাছি সময়ে কান্দাহারের নিকটবর্তী নওদাহ গ্রামের দরিদ্র এক পরিবারে তাঁর জন্ম। বংশগত তিনি পশতুন গোত্রের গুলজাই শাখার হুতাক সম্প্রদায়ভুক্ত। হুতাক বংশের সর্দার মীর বেস ১৭২১ সালে ইরানের ইস্পাহান শহর দখল করেছিলেন এবং ইরানে স্থাপন করেছিলেন আফগানী গুলজাই বংশের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি। এর পরপরই তার স্থলাভিষিক্ত হন আহমদ শাহ আবদালী।

১৯৮০ এর দশকে মোল্লা ওমরের পরিবার স্থানান্তরিত হয়ে উরযগান প্রদেশের নরে কোট এলাকায় চলে যায়। এলাকাটি খুব অনুন্নত। সোভিয়েত বাহিনী কখনও সেখানে যায়নি। মোল্লা ওমর সবেমাত্র জোয়ান, তখন তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। জীবিকার তালাশে কান্দাহার প্রদেশের মেওয়ান্দ জেলায় চলে যান তিনি। মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন নেন। একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। দুই দুই বার তার পড়াশুনা ছাড়তে হয়েছে। এক. সোভিয়েত আগ্রাসনের সময়। দুই. তালেবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সময়। তিনি খালেসের হিযবে ইসলামীর সদস্য ছিলেন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২– এই সময়ে কমাণ্ডার নেক মুহাম্মাদের নেতৃত্বে নজীবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন মোল্লা ওমর।

তিনি চারবার আহত হন। একটি আঘাত তার চোখে লাগে। যার ফলে একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। তালেবানের আন্দোল সফলতা লাভ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত 'সঙ্গেসীরের' বিভিন্ন পশতুন এলাকা অনুন্নতই রয়ে গেছে। সেখানকার ঘরবাড়ি মাটির তৈরী। মাটির সাথে ভূষি মিশিয়ে ঘরে প্রলেপ দেওয়া হয়। চারপাশে মাটির বড় বড় প্রাচীর তোলা হয়। পশতুনদের

আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে বিষয়টির বেশ গুরুত্ব রয়েছে। পথঘাট মেটে ও সংকীর্ণ। বৃষ্টি হলে কর্দমাক্ত হয়ে যায়। মোল্লা ওমরের সে মাদরাসা এখনও আছে। মাটির ছোট একটি ঘর। যার কাঁচা মেঝেতে বসা বা ঘুমানোর জন্য চাটাই বিছানো রয়েছে।

মোল্লা ওমর যে কারও সহায়তা করেন। তার সাথে কোন সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না। তবে এতটুকু বলেন, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় যেন তারা সঙ্গ দেয়। অপরের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা তাঁকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে।

মোল্লা ওমর ঘন্টাকে ঘন্টা নামাজে সময় ব্যয় করেন। নামাজ আদায় করেই তালেবানের সমর-কৌশল নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন।

মোল্লা ওমর কোনদিন প্রতিপক্ষ কিংবা জাতিসংঘের সাথে আপোষ করতে রাজি হননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল সংকল্প যুদ্ধে বিজয়ের প্রধান কারণ।

তালেবান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শারিরীক দিক থেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি মাযূর। এতে তাদের এক ধরণের গর্বও রয়েছে। দর্শকের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া জটিল যে, তাদের এ শারিরীক ওযর দেখে তারা কি আফসোস করবে, না হাসবে। ১৯৮৯ সালে মোল্লা ওমরের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তার পাশেই একটি রকেট ব্রাস্ট হওয়ার ফলে এই ঘটনা। আইন মন্ত্রী নুরুদ্দীন তুরাবী ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ গাউসেরও একটি করে চোখ ভালো। কাবুলের মেয়র আবদুল হামীদের একটি পা ও হাতের দুটি আঙুল নেই। অন্যান্য নেতাদের প্রায় সবারই এমন ওযর রয়েছে। কোন কোন কমাণ্ডারও এমন অবস্থার শিকার। সকলেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারান।

তালেবান প্রধান ও অন্যান্য নেতাদের নিষ্ঠাবান ও সুদক্ষ রণকুশলী মুজাহিদ হওয়ার একটি বড় প্রমাণ হল ১৯৯৮-৯৯ সালের তালেবান সরকারের কেন্দ্রীয় বিশ মন্ত্রীর চৌদ্দজন ছিলেন এমন, যারা রাশিয়া বিরোধী জিহাদে অংশগ্রহণ করে শরীরের কোন না কোন অঙ্গ হারিয়ে মাযূর হয়েছেন।

মূর্তি অপসারণ

আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করে তালেবান ও তার দুঃসাহসী আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ যেভাবে আল্লাহর

কালিমা ও দীন সমুন্নত রাখার ফরজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তা অত্যন্ত ঈর্ষার যোগ্য ও অনুসরণীয়। জানবাজ মুজাহিদরা আফগান ভূমি থেকে সেই সব খারাবী খতম করে দিতে দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন, যেগুলো রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টির কারণ হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

আসমান-জমীন, গ্রহ-নক্ষত্র এবং ইতিহাস স্বাক্ষী যে, কান্দাহার থেকে শুরু হওয়া তালেবান আন্দোলন সকল জীবন ব্যবস্থার উপর ইসলামকে, সকল ধর্মের উপর আল্লাহর দীনকে, সকল কিতাবের উপর কুরআনকে এবং সকল শরীয়তের উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তকে বিজয়ী করেছে।

২০০১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতায় (ফতোয়া বোর্ডে) একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়। প্রশ্নটিতে জিজ্ঞেস করা হয়, আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে মূর্তিপূজক মুশরিকদের তথাকথিত ইপাস্য মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে ইসলামের হুকুম কী? এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? এসব মূর্তি ও ভাস্কর্য আপন অবস্থায় বহাল থাকবে, না কি এগুলোর কিছু একটা করতে হবে?

কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড ও আফগান সুপ্রীম কাউন্সিল থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়–

এ সব মূর্তি ভেঙে ফেলতে হবে। এগুলো কাফেরদের উপাস্য, বিষয়টি শুধু এমনই নয়; বরং এগুলোকে আপন অবস্থায় বহাল থাকলে একসময় মুসলমানরাও এগুলোকে উপাস্য মনে পূজা শুরু করে দিবে।

সুপ্রীম কাউন্সিল ও আলেমদের ফতোয়া প্রকাশের পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি ফরমান জারি করেন। তাতে তিনি বলেন–

যেহেতু প্রকৃত ইলাহ একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাই সব মিথ্য উপাস্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। যাতে কেউ সেগুলোর পূজা বা সম্মান করতে না পারে।

যরবে মুমিন ২ রা মার্চ ২০০১ ইং

আমীরুল মুমিনীনের এই ঈমানদীপ্ত দুঃসাহসী ঘোষণার পর আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন চার হাজার মুফতী ও আলেম সুপ্রীম কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা প্রকাশ

করেন। যরবে মুমিনের রিপোর্ট অনুযায়ী মূর্তি ও ভাস্কর্য অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় ও কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর চার হাজার আফগান আলেম তার উপর সমর্থন ব্যক্ত করেন।

কান্দাহারে অবস্থিত আফগান আলেমদের কেন্দ্রীয় শূরা কমিটির প্রধান ও প্রাক্তন আফগান রাষ্ট্রদূত মুফতী মুহাম্মাদ মাসুম যরবে মুমিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তালেবান শাসকদের দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে গঠিত শূরা কমিটি চার হাজার দক্ষ আলেমের সমন্বয়ে গঠিত। যারা বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশের অধিবাসী। এর সদর দফতর কান্দাহারে। তাদের বক্তব্য, শরীয়তের হুকুম পালন করা ফরয ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান'র উপর। এক্ষেত্রে কোন বহিঃরাষ্ট্রের হুমকি-ধমকি বা ভর্ৎসনার পরোয়া করা চলবে না। মূর্তি ও ভাস্কর্য অপসারণের ক্ষেত্রেও কারও পরোয়া করা যাবে না। শরয়ী হুকুম বাস্তবায়ন করাটাই আমাদের স্থায়িত্বের রাজপথ।[১৯] যবরে মুমিন ২৩ শে মার্চ ২০০১।

আমীরুল মুমিনীন ঈদুল আযহার খুৎবায় বলেন, এ সকল মূর্তি বা ভাস্কর্য আমাদের ইতিহাসের এক শতাংশ বলা যেতে পারে। এগুলি ছাড়া বাকী ৯৯ শতাংশ আপন অবস্থায় বহাল আছে। যা আফগান জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার জন্য যথেষ্ট। উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকেক মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলাই নিয়ম। একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল এই শিরেকেরই মোকাবেলা করে গেছেন।

সিংহ পুরুষ তালেবান আমীরুল মুমিনীনের আদেশ অনুযায়ী বারুদ ব্যবহার করে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। যরবে মুমিনের রিপোর্ট অনুযায়ী তালেবান ১২৫০ মন বারুদ ব্যবহার করে বামিয়ান প্রদেশে স্থাপিত দুই হাজার বছরের পুরনো বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

এ অপারেশনে শত শত তালেবান ট্যাংক ও রকেট লান্সার নিয়ে অংশ গ্রহণ করে। লাগাতার এক সপ্তাহ চেষ্টা করে মাত্র চারটি মূর্তি ভাঙতে সক্ষম হন তারা। বড় মূর্তিটির কিছুই করা সম্ভব হয় না। এরপর কাবুল থেকে ১২৫০ মনের চেয়ে বেশি ওজনের বারুদ বামিয়ান আনা হয়।

---

[১৯] যরবে মুমিন ৯ মার্চ ২০০১

কান্দাহারের বারুদ বিশেষজ্ঞ মোল্লা লাল মুহাম্মাদকে মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বড় মূর্তিটি ভাঙার জন্য একসাথে দুই শত ট্যাংকের সাহায্যে পঁচিশ টন বারুদ নিক্ষেপ করা হয়। এক হাজার পাঁচশত কিলোগ্রাম ওজনের চব্বিশটি বোমা স্থাপন করে একই সাথে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে ভূমি কেঁপে উঠে। বিকট শব্দ চারিদিক বধির করে তোলে। আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টি গোচর হয়।

মূর্তি ভাঙার কার্যক্রম এতটাই জোরদার করা হয় যে, একে ছোটখাট কেয়ামত বলা যেতে পারে। বিস্ফোরণে পুরা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বড় মূর্তিটির নাভীর নিচের অংশ ভেঙ্গে পড়ে। ছোট মূর্তিগুলোর বিভিন্ন টুকরা এক-দেড় কিলোমিটার দূরে গিয়ে পতিত হয়। পুরো বামিয়ান এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মূর্তিগুলোর চেহারা ও মাথা ধ্বংস হয়। ১২৫০ মনের অধিক বারুদ ছাড়া আরও দুইশত ট্যাংক এতে ব্যবহৃত হয়। জেট বিমানের সাহায্যে ৫০০-১০০০ কিলগ্রাম ওজনের ৪২টি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কাবুল ও গজনীতে অবস্থিত মূর্তিগুলোও ধ্বংস করা হয়। অন্যান্য এলাকা থেকেও এই নাপাকী দূর করা হয়। এই ঈমানদ্বীপ্ত কাজের তত্ত্বধানে ছিলেন ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোল্লা উবাইদুল্লাহ, সারপুলের গভর্ণর মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফী, কমাণ্ডার মোল্লা শাহাজাদা ও মোল্লা লাল মুহাম্মাদ।[২০]

কাবুল থেকে সম্প্রচারিত রেডিও সদায়ে শরীয়ত'র পরিচালক ও প্রসিদ্ধ আফগান সাহিত্যিক মোল্লা মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন, আফগান জাতি নিজেদের জীবন থেকে পাঁচ শত বছরের বেশি সময় থেকে চলে চলমান সব অবৈধ ও অনৈতিক বিষয়াদিকে খতম করে দিয়েছে। আফগান জাতির ইতিহাস, তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও তাহজীব-তামাদ্দুনকে কবুল করার পর অন্যসব সংস্কৃতিকে ঝেড়ে বের করে দেয়। গত কয়েক বছর ধরে ইসলামী সংস্কৃতিকে মিটিয়ে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি চাপানোর জন্য অনেক চেষ্টা চালানো হয়। সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান মহীর শাহ অফিস আদালতে মহিলাদেরকে ঢুকিয়েছিলেন। তার পরে নূর মুহাম্মাদ তুরকী, হাফিযুল্লাহ আকীন, বাবরুক করমলের মত একনিষ্ট কেজিবি'র এজেন্টদের মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাফন ও

---

[২০] যবরে মুমিন ৯ ই মার্চ ২০০১

ধর্মহীন কমিউনিষ্ট সংস্কৃতিকে আফগান জনগণের উপর চাপানোর জন্য নানান অপচেষ্টা চালানো হয়।

কিন্তু আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলমান এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করে সারাদেশে এমন শিক্ষার প্রচলন ঘটায়, যার ফলে শুধু আফগানিস্তানেরই নয়, বরং যেসব দূর্বল দেশ এই ধর্মহীন শক্তির চাপে পিষ্ঠ ছিল, তারাও মুক্তি পায়। আফগান জাতি শুধু ইসলামের আলো দিয়েই দেখতে জানে। আফগান জাতির শ্রবণেন্দ্রিয় ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ শুনতে প্রস্তুত নয়।[২১]

মূর্তি অপসারণের পর আফগান উলামায়ে কেরাম যতটা খুশি ও আনন্দ অনুভব করেন, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি অনুভব করেন পাকিস্তানের উলামা-মাশায়েখ। তারা ইমারাতে ইসলামিয়ার স্থায়িত্ব ও আমীরুল মুমিনীনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে দোআ করেন।

পাকিস্তান থেকে তালেবান আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি সহায়তা দানকারী মুসলিম উম্মাহর অনুপম হিতাকাঙ্ক্ষী হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী রহ. বলেন, আফগানিস্তানের ছোট-বড় সমস্ত মূর্তি ও ভাস্কর্য অপসারণের কারণে আমীরুল মুমিনীন, উলামায়ে কেরাম ও তালেবান বিশেষ মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। তালেবানের এমন পদক্ষেপে আমি যারপরনাই আনন্দিত। তাদের জন্য আমি আল্লাহর কাছে অন্তর দিয়ে দোআ করছি। আমীরুল মুমিনীনের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ থেকে মুসলিম বিশ্বের সবক নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এমনিভাবে দারুল উলূম হক্কানিয়া, আখুড়া, খটক-এর শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা ড. শের আলী শাহ, জামিয়া ফারুকিয়া, করাচী-এর শাইখুল হাদীস মাওলানা সালীমুল্লাহ খান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের আমীর হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান, জাইশে মুহাম্মাদ-এর প্রধান হযরত মাওলানা মাসউদ আযহার, দারুল উলূম হক্কানিয়া'র পরিচালক মাওলানা সামিউল হক, শাইখুল হাদীস মাওলানা সরফরায খান সফদর, হযরত মাওলানা মুফতী হামীদুল্লাহ জান, মাওলানা হাফেজ হসাইন আহমাদ, জমিয়া নাঈমিয়া, লাহোর-এর মাওলানা সরফরায নাঈমীসহ গোটা পাকিস্তানের

---

[২১] যবরে মুমিন

উলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখ সকলেই এই কাজের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁর বলেন, তালেবান কর্তৃক মূর্তি অপসারণ ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী হয়েছে।

সারা বিশ্বের মুসলমানরা একাজটিকে ভালো নজরে দেখলেও গুটিকয়েক নামধারী আলেম এর সমালোচনা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভারতীয় আলেম মাওলানা ওয়াহীদুযযামান খান, পাকিস্তানী আলেম মাওলানা প্রফেসর তাহের আল-কাদরী, তথা কথিত ইসলামী স্কলার জাবেদ আহমাদ গামেদীর বক্তব্য শুনে মনে হয়, তাদের মুখে ভারত, ইরান, ইউনেস্কো ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কিছু ভরে দিয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও সমাবেশে তালেবানের সমালোচনা করেন, যা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ওদিকে আরবের কয়েক জন আলেম মূর্তি অপসারণ থেকে বিরত থাকার জন্য তালেবানের প্রতি আবেদন নিয়ে আফগানিস্তানে আসেন। তালেবানের ঈমানদীপ্ত আলোচনা শুনে তরা নিজেদের মতামত পরিত্যাগ করে তালেবানের প্রতি সমর্থন জানান।

ভারত, ইউনেস্কো, জাতিসংঘ ও পাকিস্তান সরকার মূর্তি অপসারণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা তদবীর করে। কিন্তু সব চেষ্টা-তদবীরই ব্যর্থ হয়। ইরান ও অন্য কয়েকটি দেশ মূর্তি ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করে। এমনকি কয়েকটি দেশ ভাঙামূর্তি কিনে নেওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। কিন্তু তালেবান ইসলামী আইনের অবিচল থাকে। মূর্তি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া বাদে অন্যসব প্রস্তাব তারা উড়িয়ে দেন।

আমেরিকার হামলার পর আমীরুল মুমিনীনের ভাষণ

৭ই অক্টোবর ২০০১। আমেরিকা আফগানিস্তানের উপর হামলা করে বসে। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ তখন জাতির উদ্দেশ্যে ঈমানদীপ্ত এক ঐতিহাসিক জিহাদী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন–

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

সম্মানিত মুসলিম ও আফগান জনতা !

ইতিহাস বলে, এটা আমাদের উপর আরোপিত তৃতীয় আগ্রাসন। বরং চতুর্থও বলা যায়। আপনারা সবাই জানেন, ইংরেজদের কোন অধিকার ছিল না যে, তারা আমাদের উপর আগ্রাসন চালাবে। সে সময় তো উসামা ছিলেন না। রাশিয়ানদেরও কোন অধিকার ছিল না আমাদের উপর আগ্রাসন চালানোর। কিংবা দেশ দখল করার। সে সময়ও উসামা ছিলেন না। যা হোক, তৃতীয় আগ্রাসন শুরু হয়েছে।

আপনারা সকলেই জানেন, এর কারণ উসামা নয়। এটা মূলত তাদের অন্তরে লালিত ইসলামের সাথে বৈরিতা ও শত্রুতারই বহিঃপ্রকাশ। ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান তাদের সুখনিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। কারণ, এখানে প্রকৃত মুসলমান রয়েছে। এখানে প্রকৃত ইসলাম রয়েছে। এখানে প্রকৃত দ্বীন ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছে। এটা তাদের জন্য হুমকির আলামত। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে নেমে পড়তে হবে। সকলেরই জানা উচিত, বর্তমান সমস্যার সমাধান শুধু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা, ধৈর্য ধারণ ও অবিচল থাকা। সফলতার পথ এগুলোই।

আমেরিকা হামলা করবে। মিসাইল নিক্ষেপ করবে। বোম্বিং করবে। যা-কিছু করবে, তা আমাদের সামনে স্পষ্ট। যদি আমরা আত্মমর্যাদা লুটিয়েও দিই, তবুও এটা আপনার ও আমার কপাল থেকে হটবে না। আমেরিকা যদি আরও কোন ষড়যন্ত্র করে থাকে, আর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাও তার অনুকূল হয়, তবে তা কখনও রহিত হওয়ার নয়। সব মুসলমানের উচিত নিজের ইসলামের প্রতি খেয়াল রাখা। আত্মমর্যাদাকে সামনে রাখা। এ বিষয়ে কারও হিম্মত হারালে চলবে না।

মরি আর বাঁচি, আমরা ইসলাম ও আত্মমর্যাদার আচল আঁকড়ে থাকব। মৃত্যু আসবেই। যে মারা যায়, সে তার ঈমান ও ইসলামকে হেফাজত করে। আত্মমর্যাদাকে সংরক্ষণ করে। এর থেকে বড় রাজত্ব আর কি হতে পারে? মৃত্যু তো সকলেরই হবে। আজ অথবা কাল। ঈমান ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে মৃত্যুবরণ অত্যন্ত দুঃখজনক। ঈমান ও আত্মমর্যাদা নিয়ে অকালে মরে যাওয়াও ভালো। মৃত্যু থেকে পলায়ন করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে অবিচল থাকুন। ধৈর্য্য ধারণ করুন। আল্লাহ তাআলার উপর

আস্থা ও ভরসা মজবুত করুন। আমার মনে হয়, কোন বিপদই আমদের ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

আর তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

আল্লাহ তাআলা বাণীর উপর বেশি ভরসা করা উচিত, না কি আমেরিকার হুমকির উপর। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করছেন, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও। মুখে মুমিন দাবি করাই ঈমানের পরিচয় নয়। বরং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন যে পরীক্ষা আসে, তা বরণ করতে প্রস্তুত থাকা। তখনই প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় পাওয়া যায়। কুফর বা আমেরিকার ধমকির মোকাবেলায় সে কী বলে, কী করে? এতেই বোঝা যাবে কার ঈমান কতটুকু? আত্মমর্যাদাবোধ আছে কি না?

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নিচ্ছেন। যাচাই করছেন প্রকৃত ঈমানদারকে। নতুবা আল্লাহ তাআলার জন্য সবকিছু আটকে দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। আমেরিকার মিসাইলও আটকে দিতে পারেন। তারা মিসাইল ছুড়বে; বোম্বিং করবে। কিন্তু কোন কিছুই হবে না। আল্লাহ তাআলা যা চান, তা-ই হয়। আমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে কি এমনটি হয়নি? ইংরেজ ও রুশ আমাদের কয়েক মিলিয়ন লোককে শহীদ করেছে। আল্লাহ তাআলা ওদেরকে প্রতিরোধ করেছেন। শহীদদের কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হটিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনি কুরবানী না করি, ঈমান ও ইসলামের উপর সামর্থ্যটুকু কাজে না লাগাই, তবে লক্ষ করুন, অন্যান্য দেশে কী অবস্থা? তাদের ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আত্মমর্যাদার শেষ অংশটুকুও। তাদের সবকিছুই কাফেরদের হাতে চলে গেছে। আমরাও কি তাদের মত হয়ে যাব?

ইতিহাস সাক্ষী, এ পর্যন্ত আফগানিস্তানের হাতে দুই আগ্রাসী শক্তি পরাজিত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে। ভেঙে খান খান হয়েছে। আফগানিস্তান আফগানিস্তানই রয়েছে। এটাই তার নাম। অন্য কোন নাম হয়নি। এটা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন দেশ। ইসলামের দেশ। ঈমানের দেশ। সে সময় কী হয়েছিল? এখনও যা হচ্ছে, তা আগের চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু হবে না। মানুষ মরছে এবং মরবে। ইসলাম এবং ঈমানের উপর মরবে। আত্মমর্যাদাবোধের

উপর মরবে। এটা কীভাবে হতে পারে যে, আমরা ঈমান থেকে ফিরে আসব? আত্মমর্যাদাবোধকে বিদায় জানাবো? এরপর মৃত্যুবরণ করব।

এ ধরনের চিন্তা কীভাবে আমাদেরকে আক্রান্ত করছে? কেউ যেন এমন চিন্তা মনে ঠাই না দেয়। বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত এই পরিস্থিতিতে জিহাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া। প্রত্যেকেই প্রস্তুত হোন। যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি ইসলামের জন্য জান দিতে প্রস্তুত। ঈমান ও ইসলামের উপর মরতে প্রস্তুত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র উপর মরতে প্রস্তুত।

আপনারা শুধু এতটুকু নিয়ত করে নিন। এরপর দেখা যাবে এই বিপদ কোথায় যায়! নিকট অতীতের প্রতি একটু দৃষ্টি বোলান। রাশিয়ান আগ্রাসী শক্তিকে কেমন বিপর্যস্ত করা হয়েছিল। ওরা কতইনা বাহাদুরী দেখিয়েছিল। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। আপনারা কি দেখছেন না যে, সেই মুজাহিদরা আপনাদেরই চারপাশে ঘুরছে? যদি আল্লাহ চান তবে আমেরিকার ক্ষেত্রেও তেমনই হবে। সুতরাং কেউ হিম্মত খাটো করবেন না। এমন কোন অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না, যার দায় তালেবান, উসামা অথবা অন্য কারও উপর বর্তায়।

আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের শপথ! আমরা যদি উসামাকে আমেরিকার দাবির পর সাথে সাথে তাদের হাতে তুলে দিতাম, তবুও এমনই হত। এমন হুমকি আসত। তবুও বলা হত তোমরা এটা কেন করেছ? ওটা কেন করেছ? এটা এভাবে করো। ওটা এভাবে কর। তাদের কথা অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করা শুরু করি, তবে আমাদের অবস্থা কী হবে? আমাদের ঈমানের অবস্থা কী হবে? আত্মমর্যাদা কোথায় থাকবে? ইসলামের কীইবা বাকী থাকবে?

এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত ঈমান ও আত্মমর্যাদাবোধের উপর অবিচল থাকা। সর্বদা দৃঢ়পদ থাকা। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে তার জীবন মূল্যহীন।

মোল্লা ওমরের জিহাদের নতুন ডাক

তালেবানের আমীর মোল্লা ওমরের নামে মিডিয়া অফিসে একটি বার্তা ফ্যাক্স করা হয়, যাতে আফগানিস্তানে অবস্থিত সকল বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে জনসাধারণের সহায়তার আবেদন করা হয়। বিবিসির

সংবাদ দাতা রহীমুল্লাহ ইউসুফ যাঈ বলেন, মোল্লা ওমরের পক্ষ থেকে লিখিত এই বার্তাটি তারই মুখপাত্র হাদিম আগা'র মধ্যস্থতায় মিডিয়ায় পৌঁছে। পশতু ভাষায় লিখিত এ বার্তাটিতে গত ঈদের ন্যায় এবারের ঈদুল আজহার শুভেচ্ছাও জানানো হয়। সকলের উদ্দেশ্যে বলা হয়, এটা কুরবানীর মাস। সবাই একথা স্মরণ রাখবেন।

বিস্তারিত বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমানে আফগানিস্তান বিদেশীদের হাতে। ওদের বিরুদ্ধে তালেবান জিহাদ ঘোষণা করেছে। জনসাধারণ আপন আপন শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী যেন তাদের সহায়তা করে। আমেরিকা যেসব ইশতেহার দিয়েছিল তার কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। এভাবে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মাদকদ্রব্যের চাষ বেড়ে গেছে। শরয়ী শাসন বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

মোল্লা ওমরের উক্ত বিবৃতি অনুযায়ী তালেবান দুই বছর আমেরিকান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করে। তালেবান সাম্রজ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে যথাসময়ে অস্ত্র হাতে নেয়। এখনও পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রয়েছে। যতক্ষণ না ওরা দেশ ত্যাগ করবে, ততদিন এ লড়াই তালেবান চালিয়েইে যাবে।

রহীমুল্লাহ ইউসুফ যাঈ'র ব্যক্তিগত অভিমত হল, মোল্লা উমরের পক্ষ থেকে লিখিত উক্ত বিবৃতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের সহায়তা চাওয়া। তিনি বলতে চেয়েছেন, তালেবান আমেরিকানদের বিরুদ্ধে নতুন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা দিয়েছে। তবে রহীমুল্লাহর অভিমত হল, আমেরিকানদের পক্ষ থেকে যেসব সামরিক অভিযানের কথা বলা হয়েছিল, এখন সেগুলো বাস্তবায়িত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মোল্লা উমরকে ক্ষমা ঘোষণা

আফগানিস্তানের সমন্বয়ক কমিটি মোল্লা ওমর ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারসহ সকল সমর বিশেষজ্ঞের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। সমন্বয়ক কমিটির প্রধান সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী ঘোষণা দেন, যে সব সমরজান্তা অস্ত্র ফেলে বর্তমান আইন মেনে নেবে, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। তালেবান আমীর মোল্লা ওমর গুলবুদ্দীন হেকমতিয়রসহ সকলেই এ ক্ষমার আওতায় আসবেন, যদি তারা বর্তমান সরকারকে বৈধ ঘোষণা দেন এবং নিজেদেরকে দেশের আইনের অনুগত মনে করেন।

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, এই ঘোষণার উদ্দেশ্য আফগানিস্তানে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা। আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন মুখপাত্র কর্ণেল জেমস ইউনিটস বলেন যে, তারা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীর কাজের উপর নজরদারী করছেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে তিনি সীমা অতিক্রম করছেন। জেমস বলেন, আমেরিকার বক্তব্য হল, যারা কোন ধরণের বিশৃঙ্খলার সাথে জড়িত, তারা যার যার কাজের জিম্মাদার। সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী বলেছেন, তাদের এই কমিটি সম্পূর্ণ স্বাধীন। একমাত্র নিরাপত্তার স্বার্থে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মোল্লা ওমর কিংবা গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

উসামা এবং মোল্লা ওমর জীবিত

তালেবানের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা টিভির এক সাক্ষাৎকারে বলেন, উসামা ও মোল্লা ওমর এখনও জীবিত আছেন। আল্লাহর রহমতে তারা খুব ভালো আছেন। তালেবান উপদেষ্টা মোল্লা আখতার উসমানী পাকিস্তানের এক বেসরকারী টেলিভেশনের সাক্ষাৎকারে বলেন, তার সাথে এখনও মোল্লা ওমরের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। তার পক্ষ থেকে তিনি নির্দেশনা গ্রহণ করেন। উসামা বিন লাদেন মার্কিন হামলার পর থেকে আত্মগোপনে আছেন।

মোল্লা আখতারের দাবীর মাত্র একদিন আগে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশাররফ অস্ট্রেলিয়ায় সফররত অবস্থায় এক বক্তৃতায় বলেন, উসামা বিন লাদেন জীবিত আছেন। একথার ভিত্তি হচ্ছে পাকিস্তানে আটক আল কায়েদার শীর্ষ নেতাদের থেকে উদ্ধারকৃত তথ্যসমূহ।

মোল্লা আখাতর বলেন, তালেবান গোটা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে আছে। কোন প্রদেশে কম এবং কোন প্রদেশে বেশি হতে পারে। কিন্তু দিন দিন তাদের দল ভারী হচ্ছে। জনসধারণ মন খুলে সহায়তা করছে। মোল্লা আখতার সাক্ষাৎকারের সময় চেহারা ঢেকে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন আমি নিজের ব্যাপারে কোন কথা বলতে প্রস্তুত নই। তালেবানের নেতৃত্ব এখনও মোল্লা ওমরের হাতে। তিনি এখনও তালেবানের শীর্ষ নেতা। তিনি বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ জারী করে থাকেন।

সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট বানাবেন না

মোল্লা ওমর তালেবানকে দেওয়া এক নির্দেশনায় বলেন, আমরা সকল বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছি। কেউ জনসাধারণকে হামলার নিশানা বানাবেন না। ঐক্য ধরে রাখুন।

এই বার্তাটি মোল্লা ওমর একটি অডিও রেকর্ডে প্রচার করেন। তিনি বলেন, আমি সমস্ত তালেবনাকে উদ্দেশ করে বলছি, আপনারা সাধারণ নাগরিকদের উপর দয়া করবেন। কারও কোন বিষয়ে বাঁধা সৃষ্টি করবেন না। নিজেদের মাঝে ঐক্য অটুট রাখুন। এ বার্তায় মোল্লা ওমর আফগান আলেমদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং বলেন, আপনারা শত্রু চিনতে ভুল করবেন না। শত্রুর অপ্রপ্রচারে প্রভাবিত হবেন না।

তিনি আরও বলেন, মুজাহিদরা আফগান আলেমদের রুহানী সন্তান। ২০০১ সালে তালেবান সরকার ক্ষমতা হারানোর পর এটা ছিল মোল্লা ওমরের কণ্ঠে ঘোষিত প্রথম কোন বার্তা। এরপর তালেবান মুখপাত্র মুফতী লতীফুল্লাহ হামীদী টেলিফোনোর মাধ্যমে সাংবাদিকদের সাথে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বলেন, আমরা কুনার থেকে গজনী আর গজনী থেকে বলখ পর্যন্ত চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট সেনা তোমায়েন করেছি। তারা মুজাহিদদের সুপ্রিম কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন। শীর্ষ তালেবান নেতা মোল্লা ওমর ন্যাটো বাহিনীর সবচেয়ে বেশি কাঙ্খিত ব্যক্তি।

সামনে আরও কঠোর হামলা হবে

তালেবান আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, আগামী মাসগুলোতে ন্যাটোর বিরুদ্ধে তালেবান কঠোর থেকে কঠোরতর হামলা উপহার দিবে। একটি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে উক্ত হুঁশিয়ারী বার্তাটি প্রচার করা হয়। বার্তায় তিনি আরও বলেন, আফগানিস্তানের বর্তমান পরজীবি সরকারকে ইসলামী আদালতে হাজির করা হবে। ইসলামী আদালতের ইনসাফের বিষয় কারও অজানা নয়।

মোল্লা ওমর কয়েক মাস আগে বলেছিলেন, হামিদ কারজাই'র কর্তৃত্ব রাজধানী কাবুলেই সীমাবদ্ধ। মোল্লা ওমর জাতিসংঘ ও ন্যাটোর নিন্দা করতে গিয়ে নিজেদেরকে ঐক্যের সাথে থাকার আহ্বান জানান। ২০০১ সালে তালেবান সরকারের পতনের পর মোল্লা ওমরের ঠিকানা কেউ জানে না।

তবে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী ধারণা করা হয় তিনি আফগানিস্তানে অথবা পাকিস্তানে রয়েছেন। এখন ন্যাটো দক্ষিণ ও পূর্ব আফগানিস্তানে ভয়ংকর হামলার শিকার হচ্ছে। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বার্তাটি রমজানের শেষে ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে প্রচার করা হয়।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সংবাদ বিশ্লেষক রহীমুল্লাহ ইউসুফ যাঈ বলেন, বার্তাটি সম্প্রচারের কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত আফগান জনগণকে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা। দ্বিতীয়ত যারা আফগানিস্তানে জিহাদে রত আছেন তাদের সাহস যোগানো। তিনি বলেন, উক্ত বার্তাটি এমন সময় প্রকাশ করা হয়, যখন ন্যাটো কমাণ্ডার আশা করছিলেন এখন হয়তো প্রতিরোধ কম হবে। এ সুযোগে আফগান জনগনের কাছাকাছি হওয়া যাবে।

রহীমুল্লাহ ইউসুফ যাঈ বলেন, শীতের কারণে তালেবান হামলা কমে যাবে, এমন ধারণা খুবই ক্ষীণ। বিশেষ করে হেলমান্দ উরযগান, কান্দাহার ও যাবেল, যেখানে শীত কিছুটা কম। কাবুল ও উত্তরাঞ্চলের তুলনায় এ এলাকাগুলি তুলনামূলক যুদ্ধের জন্য বেশি অনুকূল। বিগত শীতকালেও এসব এলাকায় হামলা কম হয়নি।

মোল্লা ওমরের নামে এক অডিও বার্তায় বলা হয়, আফগানিস্তানের সমস্যা বিদেশীদের হস্তক্ষেপ ও তাদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। বার্তায় আফগান সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়, যদি তালেবানের উপর থেকে চাপ উঠানো না হয়, তবে খুব শীঘ্রই তালেবান তোমার সরকারের তখত উল্টে দিবে।

ই-মেইলের মাধ্যমে মিডিয়ায় প্রেরিত এক অডিও বার্তায় মোল্লা ওমর আফগানিস্তানের সমস্যা ও তালেবান সমর কৌশল নিয়ে কথা বলেন। এক মিনিট আঠাইশ সেকেন্ডের এ বার্তা পোশতু ভাষায় প্রদান করা হয়েছিল। বার্তায় হামিদ কারজাই'র নাম উল্লেখ না করে তাকে সম্বোধন করে বলা হয়, কাবুল তালেবানের হাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তালেবান দূর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের সকল পাহাড় তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অডিও বার্তায় হামিদ কারজাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়, বাইরের শক্তির সহায়তায় বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। অডিও বার্তায় বক্তৃতার ঢং শুনে মনে হয়, এটা কোন সমাবেশের বক্তৃতা। অথবা অনেক লোক সামনে নিয়ে বলা বার্তা।

এর এক বছর আগে মোল্লা ওমরের নামে একটি বার্তা মিডিয়া প্রচার করেছিল, যাতে বহিরাগত সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়। মোল্লা ওমর থেকে এমন সময় বার্তাটি মিডিয়ায় এসেছিল, যখন ন্যাটো দক্ষিণ আফগানিস্তানে তালেবানের উপর ভয়াবহ হামলা চালাচ্ছিল।

সরকারের দাবী অনুযায়ী তখন একশ তালেবান শহীদ হয়। সংখ্যা বাড়িয়ে প্রচার করা মিডিয়ার চিরাচরিত অভ্যাস। অথচ একশ তালেবান শহীদ হওয়ার পরও প্রতিরোধ কমে যাওয়ার পরিবর্তে আরও বেড়ে যায়। যা পুরোটিই হাস্যকর কথা।

মোল্লা ওমরের মাথার মূল্য

অনেক সংবাদ বিশ্লেষকের বক্তব্য হল, উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন পর্বতসারীতে আত্মগোপনে থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। রানটার বলেন, আমি মুহাম্মাদ হানিফ নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে মোল্লা ওমরের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করতাম। তিনি আমাকে লিখিতভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেন। মোল্লা ওমর এক লিখিত বার্তায় পাক-আফগান উপজাতি সংক্রান্ত নতুন প্রস্তাব পাশ করাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখান করেন।

ঈদুল আযহার আগে প্রকাশিত বার্তায় তিনি বলেছিলেন, শত্রুরা এদেশ থেকে লজ্জিত ও অপদস্থ হয়ে পলায়ন করবে।

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে তালেবান ক্ষমতা হারানোর পর থেকে মোল্লা ওমর আত্মগোপনে আছেন। আমেরিকা তার মাথার মূল্য দশ মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করেছে।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর কারজাই'র সব চাল ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। হামিদ কারজাই বহু চেষ্টা করেছেন তালেবান ও সরকারের মাঝে সন্ধি স্থাপন করার জন্য। যার মূল স্বার্থ ছিল আমেরিকার। সবচেয়ে বড় কথা হল, যখন আলোচনার জন্য মোল্লা ওমর জনসম্মুখে আসবেন অথবা আড়ালে থেকে কথা বলবেন, তখন শত্রুরা তাকে আটক করার নেশায় মত্ত হবে।

মোল্লা ওমরের ঈমানদীপ্ত সাক্ষাৎকার

একটি আরবী ওয়েব সাইটে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরে'র একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাইটটি তার কথাবার্তা আরবীতে অনুবাদ

করে প্রকাশ করে। অজ্ঞাত স্থান অজ্ঞাত কেউ এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। তালেবান সরকারের প্রতনের পর সর্ব প্রথম এই সাক্ষাৎকারে আমীরুল মুমিনীনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। খবুই সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে তিনি সাক্ষাৎকারটি প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারটি পড়লে প্রত্যেক পাঠকের মনে ব্যথা ও আকুতি জাগ্রত হবে।

'সম্মানিত বন্ধুগণ! আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর খুবই গুরুত্ব সহকারে প্রদান করব। মানুষ প্রশ্নকারীর সঠিক প্রশ্নেরই উত্তর দেয়। যদি প্রশ্ন নেতিবাচক হয়, তা হলে সে রকমই উত্তর দিব। আর যদি প্রশ্ন ইতিবাচক হয়, তা হলে প্রশ্ন এড়িয়ে কিছু কথা বলব। আশা করি তাতেই আপনারা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। সাথে সাথে সকল মুসলমানের জন্য তা উপদেশও হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!.

সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের সামনে অতীতের কিছু স্মৃতিচারণ করব। পিছনের চেষ্টা মোজাহাদার কিছু বর্ণনা দেব। তবে এর দ্বারা নিজের কৃতত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধুই আপনাদের অবগতির জন্য। যদিও কুরআন মাজীদের চেয়ে বড় নসীহত আর কিছুই নেই। প্রকৃত নসীহত কুরআন মাজীদ। যে বা যারা তা পড়ে এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য।

এখানে আমি নিজের স্মৃতি থেকে কিছু কথা বলব। যখন আমার বয়স তিন বছর। শিক্ষা-দীক্ষা কেবল শুরু। তখন আমার লালন পালনের দায়িত্ব পড়ে চাচাদের কাঁধে। যখন আমার বয়স আঠার অথবা উনিশ বছর, তখন দেখেছি কমিউনিষ্টরা দেশের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। জিহাদের সময় আমি চারবার আহত হই। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বাহিনীর অনুপ্রবেশের আগে বিপ্লবের সময় একবার। জিহাদ চলাকালীন সময়ে তিনবার। রাশিয়ান বাহিনী যখন আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়, তখন আমি দ্বিতীয় বার পড়াশুনার প্রতি মনোনিবেশ করি।

যে মাদরাসাকে আমি জিহাদী মাদরাসা রূপে প্রতিষ্ঠা করি, সেখানেই নতুন করে পড়াশুনা শুরু করি। কিন্তু দেশে যে সরকার গঠিত হয়, সারা দুনিয়া তা দেখেছে। বিভিন্ন গ্রুপ লিডারদের আত্মদ্বন্দ্বে দেশে বিচারব্যবস্থা বলতে কিছু

ছিল না। এই পরিস্থিতি দীর্ঘ হওয়ায় জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে নানা কষ্ট আর মসীবত।

সাধারণ নাগরিকেরা জুলুম ও নির্যাতনের বলীতে পরিণত হয়। ভুক্তভোগীরাই ভাল জানেন বিপদ কতটা সঙ্গীন ছিল।

আমার মাথায় একটি ধারণা এসে হাযির হয়। তা হল আমি কিছু নেকার আল্লাহর বান্দাদেরকে খুঁজে বের করব, যারা নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করেন। যারা জিহাদের আগ্রহ রাখেন। যারা ইসলামী শিক্ষায় কিছুটা হলেও শিক্ষিত। তারাই এই বিপদ থেকে জাতিকে উদ্ধারের পথ বের করতে পারবেন। কাজ করতে গিয়ে আগত সকল কষ্ট-মসীবত হাস্যোজ্জ্বল বদনে মেনে নিতে পারবেন।

ভাবতে ভাবতে কিছু ত্বালেবে ইলমের সাথে আমার চিন্তার কথাটি বিনিময় করি। তাদের কাছে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য পেশ করি। আমি বলি, মুসলমানদের এসব দুঃখ-কষ্ট শেষ হওয়া দরকার। তারা আমার ডাকে সাড়া দেন। এ কাজে তারা আমাকে সহায়তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এরপর আমি চিন্তাকে বাস্তবরূপ দিতে শুরু করি। আমরা কখনও সংখ্যা স্বল্পতা বা সম্বল না থাকার দুশ্চিন্তা করিনি। এমনকি আহারের ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে, তা-ও কোনদিন ভাবিনি। কেননা, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যে তার দীনকে সাহায্য করবে, তিনি তাকে সাহায্য করবেন। আমাদের ভরসা ছিল একমাত্র আল্লাহর উপর।

কাজ শুরু হয়ে যায়। ইতিবাচক ফলাফল আসতে থাকে। এবং সেই ফলাফল বর্তমান আফগানিস্তানের রূপ নেয়। যে ব্যাপারে গোটা পৃথিবীই অবগত আছে। এর আগে আফগানিস্তানের অবস্থা কেমন ছিল, সে কথাও কারও অজানা নয়। অনেকে আমাদের এই সাফল্যের কথা স্বীকার করতে চায় না। তারা তো আমাদের এ আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা বলে, যদি রাজনৈতিক আন্দোলনই না হবে, তা হলে অল্প সময়ে এত বড় সফলতা কীভাবে লাভ হতে পারে? এত বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণও কি অরাজনৈতিক?

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা সেটা, যা আমি বলেছি। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও অপার শক্তির সামনে এটা কিছুই নয়। যে ব্যক্তি দীনের সাহায্য

করার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখে, আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন। আমরা এতদিন যা করেছি, এবং সামনে যা করব, অবশ্যই তা আমাদের দীনী কর্তব্য। আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর হামলা ও অবরোধ, নতুন কিছু নয়। নবীজীকেও অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। আমরা এই অবরোধ ভেঙে এর রোখ শত্রুদের দিকে ফিরিয়ে দিব, ইনশা আল্লাহ। যেমন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। মুসলমানদের কতর্ব্য হল ইসলামের উপর অটল থাকা। নিজের সকল দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে আদায় করা।

আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব আমাদেরকে উগ্র বলে গালি দেয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা উগ্র নই। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ইসলামে বৈধ নয়। মুসলমান আসমানী হেদায়েত অনুসারে এর সীমাও নির্ধারণ করে রেখেছে। কাফের এর সীমা কিভাবে নির্ধারণ করবে? তার কাছে তো কোন আসমানী জ্ঞান নেই। বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবও নয়।

এখানে আমি দু'টি কথা বলব। আমাদের কাজের ব্যাপারে যাদের সন্দেহ হয়, তাদেরকে বলব, তারা যেন আমাদের কাছে আসেন এবং সামনে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ করেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের কাজ বিচার করেন। যদি আমরা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী কাজ করি, তা হলে আমাদের সাথে শত্রুতা লালন করা তাদের জন্য অবৈধ নয়। আর যদি আমরা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করি, তা হলে আমরা যা করছি, সেটাই সঠিক। আমরা এর থেকে বিন্দুমাত্র হটতে রাজি নই। যদি আমরা এ অবস্থান থেকে সামান্যও সরে যাই, তা হলে আমরা প্রকৃত মুসলমান থাকতে পারব না। বরং নামের মুসলমানে পরিণত হব।

এটা অপপ্রচার আর প্রোপাগাণ্ডার যুগ। মিডিয়া যার হাতে, বিশ্ব তার হাতে। সবাই তাকে মানে। আমাদেরকে জানার জন্য মানুষের কাছে এমনসব মিডিয়াই রয়েছে, যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ শত্রুদের হাতে। আমাদের কাছে গণমাধ্যম কম ও সীমাবদ্ধ। আমাদের ভরসা আল্লাহ তাআলার সাহায্যের উপর।

তালেবানের এ আন্দোলন একটি রুহানী আন্দোলন। দুনিয়া সাক্ষী, রাশিয়া ও আমেরিকা কখনও একমত হতে পারেনি। তারা একে অপরের আজীবন শত্রু। কিন্তু আফগানিস্তানের মত এই ছোট্ট দেশটির বিরুদ্ধে তারা

মতানৈক্য ভুলে এক কাতারে শামিল হয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, তালেবান আন্দোলন একটি খালেস দীনী ও রুহানী শক্তির আন্দোলন।

মার্কিন বা রাশিয়ান মিডিয়া আমাদের ব্যাপারে যা-ই প্রচার করে, তা আগাগোড়া প্রোপাগাণ্ডা। প্রকৃতপক্ষে তারা এই রুহানী শক্তিকে জমের মত ভয় পায়। আমাদের ভরসা আল্লাহ তাআলা উপর খুব বেশি ও মজবুত। গোটা দুনিয়া দেখেছে, আমাদের বিশ্বাস থেকে আমরা বিন্দুমাত্রও সরিনি। কেনই বা আমরা তা থেকে সরে আসব? এটা আমাদের দীন, এটা আমাদের বিশ্বাস। আগামীতেও কোন দিন আমরা এই বিশ্বাস থেকে সরব না। কেননা বিশ্বাস থেকে সরে আসা মুসলমানের জন্য মৃত্যু সদৃশ।

মুসলমানের জন্য প্রকৃত মৃত্যু হল আক্বীদা-বিশ্বাস ও কুরআনের বিধানের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া। বাহ্যিক মৃত্যুর আমরা কোন পরোয়া করি না। কেননা, তা সবাইকে আস্বাদন করতে হবে। যদি আমরা প্রকৃত জীবন চাই, তা হলে আমাদেরকে মজবুতভাবে দীন আকড়ে ধরতে হবে। প্রকৃত জীবন ও হায়াত এটিই। ইসলামী জীবন যদি আমরা গড়তে না পারি, তা হলে আমাদের জন্য মৃত্যুই উত্তম। মোটকথা, সকল মুসলমানের জন্য জরুরী হল, আত্মশুদ্ধি করা, দীনী বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা মজবুত করা। ইনশা আল্লাহ, এতেই উভয় জাহানের কামিয়াবী নিহিত।

আমি ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণনা করলাম, এথেকে একজন মুসলমান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একজন সাচ্চা মুসলমানের জন্য জানা উচিত, এ পর্যন্ত যা কিছু লাভ হয়েছে, তা সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। সবই তাকদীরের ফয়সালা। আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপরই শক্তিমান। কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি যা চান, তাই করতে পারেন। আগামীতে আল্লাহ তাআলার উপর এই বিশ্বাসই থাকা চাই। আল্লাহ তাআলা যা চান তাই হবে। অন্য কিছু হবে না। আমেরিকা বা রাশিয়া নিজের পক্ষ থেকে কিছুই করতে পারবে না। আমাদের পক্ষ থেকেও কিছু করা সম্ভব নয়। সবাই আমরা আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। একথা কোন অবিশ্বাসী কাফের বুঝতে পারে না। মুসলমানদের উচিত, আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত সকল আদেশ অপকটে মেনে নেওয়া এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরন করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

আমার এ কথাগুলো আমার জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য শিক্ষা ও নসীহত। এ ছাড়া এমন কোন কথা আমার কাছে নেই, যা আমি বয়ান করতে পারি।

ইন্টারনেটে প্রদত্ত আমীরুল মুমিনীনের সাক্ষাৎকার

৫ জানুয়ারী ২০০৭ ইং তারিখে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের ই-মেঈল সাক্ষাৎকার গোটা বিশ্ব দেখেছে। মোল্লা ওমর বলেন–

'কারজাই সরকারের সাথে কোন ধরণের আলোচনা হবে না। এবং বহিরাগত শত্রু-সেনাদের পিছু হটা পর্যন্ত জিহাদ চলবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিরোধ আরও জোরদার করা হবে এবং শত্রুদের পালাতে বাধ্য করা হবে। আমরা ন্যাটো সেনাদের জানিয়ে দিয়েছি, যদি তোমরা ভাল চাও, তবে দ্রুত আফগানিস্তান ত্যাগ করো। এ পর্যন্ত যে সব প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছ, সেগুলো বিলুপ্ত করো। নতুবা ভয়াবহ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

২০০১ সালে তালেবান সরকারের পতনের পর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের এটা সর্বপ্রথম ইমেইল সাক্ষাৎকার।

তালেবান মুখপাত্র মুহাম্মাদ হানীফ এ সাক্ষাৎকারে প্রদানে সহযোগিতা করেন। তিনি বলেন, মোল্লা ওমর সংবাদপত্রে উল্লেখকৃত বিভিন্ন প্রশ্ন পড়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এই সাক্ষাৎকারে।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর বলেন, তালেবান এমন সময় ক্ষমতায় এসেছে, যখন সারা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলছিল। তালেবান যেখানে ক্ষমতালাভ করেছিল, সেখানেই রুল জারি করেছিল তার সরকার। শত্রুদের কারণে এই দূরাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যদি এটা না হত, তা হলে আমরা সুন্দর ও শান্তির দেশ উপহার দিতাম। আমরা বুকে হাত রেখে বলতে পারি, তালেবানের চেয়ে নিরাপত্তাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল শাসন আজ পর্যন্ত কেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

উসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে আশ্রয় দেওয়াটা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। যারা এই বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের কথার কোনই যুক্তি নেই। আমরা কখনও উসামাকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করতে মনস্থ করিনি। যদি করতাম, তা হলে আমাদের এতবড় কুরবানী দিতে হত না।

বামিয়ানের মূর্তি ভাঙা সম্পর্কে তিনি বলেন, শরীয়ত তো শরীয়ত। অসংখ্য অগনিত মুসলমান বিধর্মীদের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত থাকবে, তা হতে পারে না।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, তালেবান নারীশিক্ষা নিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। খুব দ্রুত সেটা চালু করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম।

আত্মঘাতী হামলার ব্যাপরে তিনি বলেন, তালেবান না জেনে কোন কাজ করে না। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফতোয়া অনুযায়ী তালেবান আমল করে।

তিনি বলেন, ২০০১ সালে তালেবান শাসন শেষ হওয়ার পর কখনও উসামা বিন লাদেনকে দেখেনি। এবং দেখার আগ্রহও প্রকাশ করেনি। তবে আমি তার সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য দুআ করি।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর বলেন, এ পর্যন্ত তালেবান পাকিস্তান থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করেনি। কেউই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারবে না। পাশ্চত্যের মিডিয়া তথ্য প্রমাণ ছাড়াই কারও উপর অভিযোগ চাপিয়ে দেয়। এটা তাদের স্বভাব। অপপ্রচার চালিয়ে তারা যুদ্ধের ফায়দা লুটতে থাকে।

তিনি বলেন, তালেবান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যগণ আফগানিস্তানেই আছেন।

তিনি আরও বলেন, সাধারণ জনগণ আমাদের সাথেই আছে। তারা সর্বতভাবে আমাদের সহযোগিতা করছ। কোন জাতি বা সাম্প্রদায়িক মানসিকত থেকে নয়; বরং তারা ইসলাম ও জিহাদে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সহযোগিতা করছে।

এনএনআই
৫ জানুয়ারী ২০০৭ ইং

পুরো আফগানিস্তান এক হয়ে যাবে

বৃটিশ আগ্রাসনের কয়েক দশক পর মার্কিন আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য আজ তালেবান লড়াই করছে।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর বলেন, প্রায় ৭০ বছর আগে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেমন আফগান জাতি এক হয়ে লড়েছিল, তেমনই আজও যদি আমরা সকলে প্রতিরোধ গড়ে তুলি, তা হলে দখলদার

বাহিনী পালাতে বাধ্য হবে। সুতরাং ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব, পুলিশ প্রশাসন, ইন্টেলেজেন্সসহ সকলের উচিত এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। তবেই সম্ভব আগ্রাসী শক্তির কালো হাতকে ভেঙে চুরমার করা।

আজ আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সন্তানরা এতীম হচ্ছে। মুজাহিদরা অসহায় অবস্থায় শহীদ হচ্ছে, জেলে বন্দী হচ্ছে। দেশ শত্রুদের দখলে। আকাশসীমা শত্রুর বিমানের দখলে। এখনও যদি আমরা নিজেদের দরদ না বুঝি, তা হলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের নেতৃত্বে তালেবান ময়দানে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। যার কারণে শত্রু নড়ে চড়ে বসছে। চারিদিক থেকে গুছিয়ে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুতিও নিচ্ছে তারা। কারজাইর ক্ষমতা মূলত কাবুলেই সীমাবদ্ধ। সারাদেশে মোল্লা ওমরের হুকুমই বাস্তবায়িত হচ্ছে। তালেবানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা না থাকলেও বাস্তব সমাজে তাদেরই শাসন চলমান।

তালেবান পুনরায় ক্ষমতা লাভ করবে। ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠিত হবে। আফগানিস্তানে ঘন দাড়িওয়ালাদের শাসন কায়েম হবে। লম্বা জামাওয়ালারা দেশ পরিচালনা করবেন। কালেমাখচিত সাদা-কালো পতাকা আফগান আকাশে পতপত করে উড়বে। গোটা বিশ্বের অসহায় ও নির্যাতিত মুসলমানরা সে পতাকাতলে জড় হয়ে কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে।

সেদিন বেশী দূরে নয়। বিশ্বাস করুন, সেদিন বেশি দূরে নয়।

এতীমদের সাহায্য করুন

যুদ্ধে যেসব বাচ্চাদের ভাই, পিতা, অথবা অভিভাবক শহীদ হয়ে গেছেন, সেসব শিশুদের সহায়তা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। তাদের লেখাপড়া, বাসস্থান, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে অর্থকড়ি খরচ করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

আজ খৃষ্টানরা এনজিও'র মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কত অনুদান প্রদান করছে। মুসলমান বাচ্চাদের মন মস্তিষ্ক বিগড়ে দেওয়ার জন্য কতসব কৌশল অবলম্বন করছে। এর বিপরীতে আমরা কি করছি? আমরা যদি এসব অসহায়, অনাথ ও এতীম শিশুদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই, তা হলে ওদের সব অপচেষ্টা মাটিতে মিশে যেতে বাধ্য হবে ইনশা আল্লাহ।